আল আন'আম

৬

নামকরণ

এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ'তে কোন কোন আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোন কোনটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল আন'আম নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিল। হযরত মু'আয ইবনে জাবালের চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখন আমি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনীর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে লিপিবদ্ধও করান।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মক্কী যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদের রেওয়ায়াতটিও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তরভুক্ত। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি নিছক ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরেববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত বেশী ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একটি মহিলা তার খেদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সহজেই এর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। আল্লাহর রসূল যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করেছিলেন তারপর থেকে বারোটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারা হাবশায়

(ইথিওপিয়া) অবস্থান করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য–সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদীজা (রা) কেউই বেঁচে ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কায় ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎলোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা দিয়েছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ ছোট্ট একটি প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোন স্থূলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোন বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহবায়কের পেছনে তার পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য–সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমনভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝরে পড়ে।

আলোচ্য বিষয়

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ শিরককে খণ্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহবান জানানো।

দুই ঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিন ঃ জাহেলীয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবে ছিল তার প্রতিবাদ করা।

চার ঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয় ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাত ঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

কিন্তু এখানে যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তাতে এক একটি শিরোনামের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে একই জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করার রীতি অনুসৃত হয়নি। বরং ভাষণ এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে আর তার মাঝখানে এ শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন ভংগীতে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

এখানে পাঠকের সামনে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত মক্কী সূরা আসছে। তাই এ প্রসংগে মক্কী সূরাগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশদ আলোচনা করে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। এ ধরনের আলোচনার পরে পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মক্কী সূরা আসবে এবং তাদের ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি যেসব কথা বলবো সেগুলো অনুধাবন করা সহজ হবে।

মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোর নাযিলের সময়কাল আমাদের জানা আছে অথবা সামান্য চেষ্টা–পরিশ্রম করলে তার সময়–কাল চিহ্নিত করে নেয়া যেতে পারে। এমনকি সেসব সূরার বহু সংখ্যক আয়াতের পর্যন্ত নাযিলের উপলক্ষ ও কারণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলো সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত তথ্য–উপকরণ আমাদের কাছে নেই। খুব কম সংখ্যক সূরা এমন রয়েছে যার নাযিলের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কারণ মাদানী যুগের তুলনায় মক্কী যুগের ইতিহাসে খুটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কম। তাই মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ–প্রমাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সূরার নাযিলের পটভূমি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইশারা–ইংগিতের আকারে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণ রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করতে হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের সাক্ষ–প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অংগুলি নির্দেশ করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এটি অমুক তারিখে অমুক বছর বা অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুলভাবে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, একদিকে আমরা মক্কী সূরাগুলোর ভেতরের সাক্ষ–প্রমাণ এবং অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাস পাশাপাশি রেখে এবং উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কোন্ সূরা কোন্ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল সে সম্পর্কে একটি মত গঠন করতে পারি।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু' বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস, দোষারোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামূলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বান্ধবহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায় ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল তথা ১০ম বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়-কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমর্থক ও সংগী-সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তাঁর জন্য মক্কায় জীবন যাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন। সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময়ে আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহবানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

এ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কুরআন মজীদের যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি তাদের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা রীতির দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এক পর্যায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী অন্য পর্যায়ের আয়াতের থেকে ভিন্নধর্মী। এদের বহু স্থানে এমন সব ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের পটভূমির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্টের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে বিপুলভাবে লক্ষণীয়। এসব আলামতের ওপর নির্ভর করে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত প্রত্যেকটি মক্কী সূরার ভূমিকায় সেটি মক্কী যুগের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয় তা জানিয়ে দেবো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٥﴾

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তবুও সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।[১] তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[২] তারপর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন জীবনের একটি সময়সীমা এবং আর একটি সময়সীমাও আছে, যা তাঁর কাছে স্থিরীকৃত,[৩] কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত রয়েছো।

তিনিই এক আল্লাহ আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতেও, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই জানেন এবং ভালো বা মন্দ যা–ই তোমরা উপার্জন করো তাও তিনি ভালোভাবেই অবগত।

মানুষের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদের রবের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এমন কোন নিদর্শন নেই যা তাদের সামনে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। অনুরূপভাবে এখন যে সত্য তাদের কাছে এসেছে তাকেও তারা মিথ্যা বলেছে। ঠিক আছে, এতদিন পর্যন্ত যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছে শীঘ্রই সে সম্পর্কে কিছু খবর তাদের কাছে পৌঁছুবে।[৪]

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে এমনি ধরনের কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজ নিজ যুগে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী? পৃথিবীতে তাদেরকে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (কিন্তু যখন তারা নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো তখন) অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের জায়গায় পরবর্তী যুগের মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

১. মনে রাখতে হবে, এখানে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। আর এ মুশরিকরা একথা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। তিনি দিন ও রাতের উদ্ভব ঘটান। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কাজগুলো লাত, উয্যা, হোবল অথবা আর কোন দেবদেবী করেছে–এ ধরনের কোন বিশ্বাস তাদের কেউ পোষণ করতো না। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ মূর্খরা! যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করে থাকো যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ এবং দিন–রাতের আবর্তন তিনিই করান তখন তোমরা আবার অন্যের সামনে সিজদা করো কেন? তাদেরকে নযরানা দাও, তাদের কাছে প্রার্থনা করো এবং নিজেদের অভাব–অভিযোগ পেশ করো কেন? এরা কারা? (সূরা ফাতহা ২ টীকা এবং সূরা আল বাকারা ১৬৩ টীকা দেখুন)।

আলোর মোকাবিলায় 'অন্ধকার' শব্দটিকে বহুবচনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কারণ, অন্ধকার বলা হয় আলোবিহীনতাকে আর আলোবিহীনতার রয়েছে অসংখ্য পর্যায়। তাই আলো এক বা একক এবং অন্ধকার একাধিক, বহু।

২. মানব দেহের সমুদয় অংশ মাটি থেকে গৃহীত। এর সামান্যতম অংশও অ–মৃত্তিকা নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের সময়। তখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দেবার জন্য তারা তাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাবে।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑧

হে নবী! যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা কোন কিতাবও নাযিল করতাম এবং লোকেরা নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেও দেখে নিতো, তাহলেও আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তারা তখন বলতো, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন?[৫] যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে আর কোন অবকাশই দেয়া হতো না।[৬]

৪. এখানে হিজরত এবং হিজরতের পরে ইসলাম একের পর এক যেসব সাফল্য অর্জন করবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। যখন এ ইংগিত করা হয়েছিল সে সময় কোন্ ধরনের খবর পৌঁছুবে সে সম্পর্কে কাফেররা কোন কল্পনাই করতে পারেনি এবং মুসলমানদেরও এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

৫. অর্থাৎ যখন এ ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেশতাও পাঠানো উচিত ছিল। এ ফেরেশতা লোকদের ডেকে ডেকে বলবে, ইনি আল্লাহর নবী, এঁর কথা মেনে চলো, নয়তো তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। মূর্খ আপত্তিকারীরা অবাক হচ্ছিল এ ভেবে যে, পৃথিবী ও আকাশের মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী স্রষ্টা একজনকে নিজের পয়গম্বর নিযুক্ত করবেন এবং তাকে মানুষের গালিগালাজ ও প্রস্তরাঘাত সহ্য করার জন্য সহায় সম্বলহীনভাবে ছেড়ে দেবেন, এটা কেমন করে হতে পারে? এত বড় বাদশাহর দূত বিপুল সংখ্যক রাজকীয় ও সরকারী আমলা কর্মচারীসহ না এলেও অন্তত আরদালী হিসেবে একজন ফেরেশতাকেও তো সংগে নিয়ে আসবেন। সে ফেরেশতা তাঁর হেফাজত করতো, মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করতো, তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একথা সবাইকে বুঝাতো এবং অস্বাভাবিক ও অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করতো।

৬. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়–সুযোগ ও অবকাশ লাভ করেছো এর সময়সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যের পর্দান্তরালে গোপন রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগও শেষ হয়ে যাবে। এরপর শুধু হিসেব নেবার কাজটি বাকি থাকবে। কেননা দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্য একটি

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং এভাবে তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে।[৭]

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও অনেক রসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যে অকাট্য সত্য নিয়ে বিদ্রূপ করতো, সেটাই অবশেষে তাদের ওপর চেপে বসেছিল।

পরীক্ষাকাল। পরীক্ষা হচ্ছে এ বিষয়ের যে, প্রকৃত সত্যকে না দেখে নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তোমরা তাকে উপলব্ধি করতে ও জানতে পারো কি না এবং এ উপলব্ধি করার ও জানার পর নিজেদের নফস ও তার কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃত সত্যের নিরীখে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে চালাতে পারো কি না। এ পরীক্ষার জন্য অদৃশ্যের অদৃশ্য থাকাটা হচ্ছে একটি অপরিহার্য শর্ত। আর তোমাদের দুনিয়ার জীবন, যা আসলে পরীক্ষার অবকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এটিও ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যতক্ষণ অদৃশ্য অদৃশ্যই থাকে। যখনই অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে যাবে তখনই অবশ্যি এ অবকাশ খতম হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে। কাজেই তোমাদের দাবী অনুসারে ফেরেশতাকে তার আসল চেহারায় তোমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ এখনই তোমাদের পরীক্ষার সময়কাল শেষ করে দিতে চান না। (সূরা আল বাকারার ২২৮ টীকা দেখুন)।

৭. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। প্রথমত ফেরেশতা তার আসল অদৃশ্য আকৃতিতে আসতে পারতো এবং এভাবে নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু আগেই বলে দেয়া হয়েছে, এখনো তার সময় হয়নি। দ্বিতীয়ত ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে আসতে পারতো। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যদি সে মানুষের রূপ ধরে আসতো, তাহলে সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছে সে ব্যাপারে তোমাদের মনে সে একই সন্দেহ ও বিভ্রম সৃষ্টি হয়ে যেতো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির ব্যাপারে তোমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

এদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে একটু চলাফেরা করে দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৮]

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো কার?—বলো, সবকিছু আল্লাহরই।[৯] *অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করা তিনি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। (এ জন্যই তিনি নাফরমানী ও সীমালংঘন করার অপরাধে তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সবাইকে অবশ্যি একত্র করবেন। এটি এমন একটি সত্য যার মধ্যে সংশয়–সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা মানে না।*

রাতের আঁধারে ও দিনের আলোয় যা কিছু বিরাজমান সবই আল্লাহর এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৮. অর্থাৎ যেসব জাতি ও মানব গোষ্ঠী দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহ একথার সাক্ষ দেবে যে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার এবং বাতিলের অনুসৃতির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে কিভাবে তারা শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

৯. এটি একটি চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী। প্রথমে হুকুম হলো, এদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো কার? প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষায় থেমে রইল। যদিও শ্রোতা নিজেই স্বীকার করে যে, সবকিছু আল্লাহর তবুও সে ভুল জবাব দেবার সাহস করে না আবার সঠিক জবাব দিতেও চায় না। কারণ সঠিক জবাব দিলে তার আশংকা যে, বিরোধী পক্ষ তা থেকে তার মুশরিকী আকীদার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে তাই সে জবাব না দিয়ে নীরব থাকে। তখনই হুকুম হয়, তাহলে তুমি নিজেই বলে দাও ঃ সবকিছু আল্লাহরই জন্য।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾ قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾
وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ﴿۱۸﴾

বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে—যিনি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এবং যিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না।[১০] বলো, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করি। (আর তাকিদ করা হয়েছে, কেউ শিরক করলে করুক) কিন্তু তুমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে ভয় হয় একটি মহা (ভয়ংকর) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে আল্লাহ তার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য। যদি আল্লাহ তোমার কোন ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তাহলে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সবকিছু জানেন।

১০. এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পরিহাস নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে তারা সবাই নিজেদের এ বান্দাদেরকে জীবিকা দেবার পরিবর্তে বরং এদের থেকে জীবিকা লাভের মুখাপেক্ষী। কোন ফেরাউন তার বান্দাদের কাছ থেকে কর ও নযরানা না পেলে প্রভুত্বের দাপট দেখাতে পারে না। কোন কবরে সমাহিত ব্যক্তির পূজারীরা যদি তার কবরে জমকালো গম্বুজ তৈরী না করে দেয় তাহলে তার উপাস্য ও আরাধ্য হবার চমক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন দেবতার পূজারীরা তার মূর্তি বানিয়ে কোন বিশাল মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে রেখে তাকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (১৯) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (২০)

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ সবচেয়ে বড়?—বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।[১১] আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ দিতে সক্ষম যে, আল্লাহর সাথে আরো ইলাহও আছে?[১২] বলে দাও, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ দিতে পারি না।[১৩] বলো, আল্লাহ তো একজনই এবং তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ বিষয়টিকে এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনার ব্যাপারে তারা সন্দেহের শিকার হয় না।[১৪] কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তারা একথা মানে না।

না করা পর্যন্ত সে দেবতার দেব মহিমা ও খোদায়ী কর্তৃত্ব ব্যক্ত হবার কোন পথ পায় না। এসব বানোয়াট ইলাহদের গোষ্ঠীই তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। একমাত্র সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহই সে আসল আল্লাহ, যাঁর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রভুত্বের গৌরব তাঁর আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. অর্থাৎ এ মর্মে সাক্ষী যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এবং যা কিছু বলছি তাঁরি নির্দেশ অনুসারে বলছি।

১২. কোন বিষয়ের সাক্ষ দেবার জন্য কেবল আন্দাজ-অনুমান যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য যেন সে এহেন নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলতে পারে যে, হাঁ, ব্যাপারটি ঠিক এরূপই। কাজেই এখানে প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, সত্যিই কি তোমরা নির্ভুলভাবে একথা জানো যে, এ বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভু আছে, যে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা লাভের যোগ্য?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ
شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকু'

আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে[১৫] অথবা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে?[১৬] অবশ্যি এ ধরনের জালেমরা কখনই সফলকাম হতে পারে না।

যেদিন এদের সবাইকে একত্র করবো এবং মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করবো, এখন তোমাদের মনগড়া সেই শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ মনে করতে? তখন তারা এ (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের প্রভু! তোমার কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না। দেখো, সে সময় এরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে নেবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত বানোয়াট মাবূদ উধাও হয়ে যাবে।

১৩. অর্থাৎ যদি তোমরা নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া নিছক মিথ্যা সাক্ষ দিতে চাও, তাহলে দিতে পারো কিন্তু আমি তো এ ধরনের সাক্ষ দিতে পারি না।

১৪. অর্থাৎ যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে, তারা সন্দেহাতীতভাবে এ সত্যটি জানে ও উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ একক সত্তা এবং তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্বে আর কেউ শরীক নয়। যেমন কারোর ছেলে অন্যান্য ছেলেদের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে তাকে চিনে নেয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখে, সে ইলাহী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে মানুষের অসংখ্য আকীদা, বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্য থেকে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই প্রকৃত সত্যটি সহজেই চিনে নেয়।

১৫. অর্থাৎ এ মর্মে দাবী করে যে, প্রভুত্বের ব্যাপারে আরো অনেক সত্তা আল্লাহর সাথে শরীক। তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার গুণাবলী এবং তারা মানুষের সামনে তাদের বন্দেগীলাভ করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করার যোগ্যতা

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

এদের কিছু লোক কান পেতে তোমার কথা শোনে কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছি যার ফলে তারা এর কিছুই বোঝে না এবং তাদের কানে ভার রেখে দিয়েছি (যার ফলে সবকিছু শোনার পরও তারা কিছুই শোনে না)।[১৭] তারা যে নিদর্শনই প্রত্যক্ষ করুক তার ওপর ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে তোমার সাথে ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে তারা (সমস্ত কথা শোনার পর) একথাই বলে যে, এটি প্রাচীন কালের একটি গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৮] তারা এ মহাসত্যবাণী গ্রহণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর কাছ থেকে দূরে পালায়। (তারা মনে করে এ ধরনের কাজ করে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করছে) অথচ আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করে না।

রাখে। তাছাড়া আল্লাহ অমুক অমুক সত্তাকে নিজের বিশেষ নিকটতম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন অথবা কমপক্ষে তাদের সাথে ইলাহসুলভ গুণাবলী সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সম্মত রয়েছেন এবং আল্লাহর সাথে বান্দার যে ধরনের আচার–আচরণ করা উচিত তাদের সাথেও সে ধরনের আচরণ করতে হবে—কারোর এ জাতীয় কথা বলাও আল্লাহর প্রতি এক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ।

১৬. আল্লাহর নিদর্শনাবলী বলতে এমন সব নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, নবী–রসূলগণের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেগুলোর প্রকাশ ঘটেছে এবং যেগুলো আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত নিদর্শন একটি মাত্র সত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে সত্যটি হচ্ছে, এ সৃষ্টিজগতের বুকে যা কিছু অস্তিত্বমান তার মধ্যে বিধাতা ও মনিব মাত্র একজনই এবং বাকি সবাই প্রজা ও বান্দা। এখন যে ব্যক্তি এ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় প্রকৃত ও যথার্থ সাক্ষ–প্রমাণ ছাড়াই, কোন জ্ঞান, প্রত্যক্ষ

দর্শন ও কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই নিছক আন্দাজ–অনুমান বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে উপাস্য ও পূজনীয় হবার গুণাবলী সংযুক্ত করে এবং আল্লাহ যেসব অধিকার এককভাবে লাভ করেন, তাদেরকে সেগুলোর যোগ্য গণ্য করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। তারা সুস্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান সত্যের প্রতি অবিচার ও জুলুম করছে। তারা নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করছে। তারা এ ভ্রান্ত মতাদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব–জাহানের যেসব জিনিসের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের সাথে জুলুম করছে।

১৭. এখানে একথাটি সামনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক আইনের আওতায় দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে সবকিছুকেই আল্লাহ নিজের কাজ বলে দাবী করেন। কারণ এ আইন আসলে আল্লাহর তৈরী এবং এর আওতায় যা কিছু সংঘটিত হয় তা মূলত আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই বাস্তব রূপ লাভ করে। হঠকারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের সবকিছু শোনার পরও কিছু না শোনা এবং সত্যের আহবায়কের কোন কথা তাদের মনের গহনে প্রবেশ না করা তাদের একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও স্থবিরতার স্বাভাবিক ফল। যে ব্যক্তি জিদ ও হঠকারিতার শিকার হয় এবং সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা পরিহার করে সত্যনিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয় না। তার মনের দরজা তার কামনা ও প্রবৃত্তি বিরোধী প্রতিটি সত্যের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এটিই প্রকৃতির আইন। একথাটি বলার সময় আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির মনের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ একথাটি বলার সময় বলেন, তার মনের দরজা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করি আর আল্লাহ বর্ণনা করেন ঘটনার অভ্যন্তরের প্রকৃত সত্য।

১৮. মূর্খ ও নির্বোধদের সত্যের দিকে আহবান জানালে তারা সাধারণত বলে থাকে, তুমি আর নতুন কথা কি বললে? এসব তো সে পুরনো কথা, যা আমরা আগে থেকেই শুনে আসছি। যেন এ নির্বোধদের মতে কোন কথা সত্য হতে হলে তা একেবারে আনকোরা নতুন হওয়া চাই এবং পুরনো কোন কথা সত্য হতে পারে না। অথচ সত্য প্রতি যুগেই এক এবং চিরকাল একই থাকবে। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যারা মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন তারা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে একই সত্য পেশ করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের উৎস থেকে লাভবান হয়ে কিছু পেশ করবেন তিনিও এই একই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিই করবেন। অবশ্যি নতুন ও উদ্ভট অলীক কথা কেবল তারাই উদ্ভাবন করতে পারবেন যারা আল্লাহর আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে আদি ও চিরন্তন সত্য প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন এবং নিজেদের কিছু মনগড়া মতবাদকে সত্যের নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন। এ ধরনের লোকেরাই নিসন্দেহে এমন নতুন ও আজগুবী কথা বলতে পারেন, যা তাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেই কোনদিন বলেনি।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ
قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

হায়! যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, হায়! যদি এমন কোন উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। আসলে একথা তারা নিছক এ জন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।[১৯] নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে আবার তারা সে সবকিছুই করে যাবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুকই (তাই নিজেদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও তারা মিথ্যারই আশ্রয় নেবে)। আজ এরা বলে, জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা কেবল এ দুনিয়ার জীবনটুকুই এবং মরার পর আমাদের আর কোনক্রমেই উঠানো হবে না। হায়! সেই দৃশ্যটা যদি তোমরা দেখতে পারতে যখন এদেরকে এদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। সে সময় এদের রব এদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এটা কি সত্য নয়"? এরা বলবে, "হাঁ, হে আমাদের রব! এটা সত্যই।" তিনি বলবেন, "আচ্ছা, এবার তাহলে নিজেদের সত্য অস্বীকারের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

১৯. অর্থাৎ তাদের একথা আসলে বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তা-ভাবনার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত এবং তার ভিত্তিতে কোন যথার্থ মত পরিবর্তনের ফল হবে না। বরং তা হবে নিছক সত্যের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ফল, যার পরে কোন কট্টর কাফেরও আর অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সাক্ষাতের ঘোষণাকে মিথ্যা গণ্য করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন অকস্মাৎ সে সময় এসে যাবে তখন এরাই বলবে, "হায়, আফসোস! এ ব্যাপারে আমাদের কেমন ভুল হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেদের পিঠে নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে। দেখো, কেমন নিকৃষ্ট বোঝা এরা বহন করে চলছে! দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল–তামাসার ব্যাপার।[২০] আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো। তবে কি তোমরা বুদ্ধি–বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না?

হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।[২১]

২০. এর মানে এ নয় যে, দুনিয়ার জীবনটি নেহাত হাল্‌কা ও গুরুত্বহীন বিষয়, এর মধ্যে কেন গাম্ভীর্য নেই এবং নিছক খেল–তামাসা করার জন্য এ জীবনটি তৈরী করা হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আখেরাতের যথার্থ ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবনটি ঠিক তেমনি যেমন কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে চিত্তবিনোদন করে তারপর তার আসল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারবারে মনোনিবেশ করে। তাছাড়া একে খেলাধূলার সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে প্রকৃত সত্য গোপন থাকার ফলে যারা ভেতরে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরেরটুকু দেখতে অভ্যস্ত তাদের জন্য বিভ্রান্তির শিকার হবার বহুতর কারণ বিদ্যমান। এসব বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মানুষ প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে এমন সব অদ্ভুত ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলশ্রুতিতে তাদের জীবন নিছক একটি খেলা ও তামাসার বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন যে ব্যক্তি এ

পৃথিবীতে বাদশাহের আসনে বসে তার মর্যাদা আসলে নাট্যমঞ্চের সেই কৃত্রিম বাদশাহর চাইতে মোটেই ভিন্নতর নয়, যে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে এবং এমনভাবে হুকুম চালাতে থাকে যেন সে সত্যিকারের একজন বাদশাহ। অথচ প্রকৃত বাদশাহীর সামান্যতম নামগন্ধও তার মধ্যে নেই। পরিচালকের সামান্য ইংগিতেই তার বরখাস্ত, বন্দী ও হত্যার সিদ্ধান্তও হয়ে যেতে পারে। এ দুনিয়ার সর্বত্র এ ধরনের অভিনয়ই চলছে। কোথাও কোন পীর–অলী বা দেব–দেবীর দরবারে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। অথচ সেখানে মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতার লেশ মাত্রও নেই। কোথাও অদৃশ্য জ্ঞানের কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। অথচ সেখানে অদৃশ্য জ্ঞানের বিন্দু বিসর্গও নেই। কোথাও কেউ মানুষের জীবিকার মালিক হয়ে বসে আছে। অথচ সে বেচারা নিজের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোথাও কেউ নিজেকে সম্মান ও অপমানের এবং লাভ ও ক্ষতির সর্বময় কর্তা মনে করে বসে আছে। সে এমনভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজিয়ে চলছে যেন মনে হয়, আশপাশের সমুদয় সৃষ্টির সে এক মহাপ্রভু। অথচ তার ললাটে চিহ্নিত হয়ে আছে দাসত্বের কলংক টীকা। ভাগ্যের সামান্য হেরফেরেই শ্রেষ্টত্বের আসন থেকে নামিয়ে তাকে সেসব লোকের পদতলে নিষ্পিষ্ট করা হতে পারে যাদের ওপর কাল পর্যন্তও সে প্রভুত্ব ও কৃর্তত্ব চালিয়ে আসছিল। দুনিয়ার এই মাত্র কয়েকদিনের জীবনেই এসব অভিনয় চলছে। মৃত্যুর মুহূর্ত আসার সাথে সাথেই এক লহমার মধ্যেই এসব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। এ জীবনের সীমান্ত পার হবার সাথে সাথেই মানুষ এমন এক জগতে পৌঁছে যাবে যেখানে সবকিছুই হবে প্রকৃত সত্যের অনুরূপ এবং যেখানে এ দুনিয়ার জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তির আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হবে কি পরিমাণ সত্য সে সাথে করে এনেছে। সত্যের মীযান তথা ভারসাম্যপূর্ণ তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে তার মূল্য ও মান নির্ধারণ করা হবে।

২১. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতিকে আল্লাহর আয়াত শুনাতে শুরু করেননি ততদিন তারা তাঁকে "আমীন" ও সত্যবাদী মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতো। যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। এ দ্বিতীয় যুগেও তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস করতে পরতো। তাঁর কোন কট্টর বিরোধীও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো এ ধরনের দোষারোপ করেনি যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন। নবী হবার কারণে এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই তারা তাঁকে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল আবু জাহেল। হযরত আলীর (রা) বর্ণনা মতে একবার আবু জাহেল নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ প্রসংগে বলে ঃ

انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به

"আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না বরং আপনি যা কিছু পেশ করছেন সেগুলোকেই মিথ্যা বলছি।"

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا
حَتّٰى أَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ
نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই[২২] এবং আগের রসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌছে গেছে। তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো।[২৩] আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[২৪]

বদর যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শারীক নিরিবিলিতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞেস করে, "এখানে আমি ও তুমি ছাড়া আর তৃতীয় কেউ নেই। সত্যি করে বল তো, মুহাম্মাদকে তুমি সত্যবাদী মনে করো, না মিথ্যাবাদী? আবু জাহেল জবাব দেয়, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী। সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, আল্লাহর ঘরের পাহারাদারী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও নবুওয়াত সবকিছুই 'কুসাই' বংশের লোকদের ভাগে পড়ে তখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখার ভাগে কি থাকে বলো?" তাই এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তারা তোমার নয় বরং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে আর আমি যখন এসব সহ্য করে নিচ্ছি এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে চলছি তখন তুমি কেন অস্থির হয়ে পড়েছো?

২২. অর্থাৎ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরী করে দিয়েছেন, তা বদলে দেবার ক্ষমতা কারোর নেই। সত্যপন্থীদের অবশ্যি দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার। বিপদ, মুসিবত, সমস্যা ও সংকটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্ট করতে হবে, যা কেবল মাত্র ঐ কঠিন বিপদ সংকুল গিরিবর্তেই

লালিত হতে পারে। তাদের শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে উন্নত সংস্কারকারী বলে প্রমাণ করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য যথা সময়ে তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য এগিয়ে আসবে। সময় হবার পূর্বে কেউ হাজার চেষ্টা করেও তাকে আনতে পারবে না।

২৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখতেন, এ জাতিকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল হয়ে গেলো অথচ এরা কোনক্রমেই হেদায়াতের পথে আসছে না, তখন অনেক সময় তাঁর মনের গহনে এ ধরনের ইচ্ছা ও বাসনা জন্ম নিতো যে, আহা, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হতো, যার ফলে এরা কুফরী পরিহার করে আমার দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিতো। তাঁর এ ইচ্ছা ও বাসনার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অধৈর্য হয়ো না। যে বিন্যাস ও ধারবাহিকতা সহকারে আমি এ কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার ওপর সবর করে এগিয়ে চলো। অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হলে তা কি আমি নিজেই নিতে পারতাম না? কিন্তু আমি জানি, তোমাকে যে চিন্তাগত ও নৈতিক বিপ্লব এবং যে সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবনধারা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে সফলতার মনযিলে পৌছাবার সঠিক পথ এটা নয়। তবুও যদি লোকদের বর্তমান নিশ্চলতা ও অস্বীকৃতির অচলায়তনের মোকাবিলায় তুমি সবর করতে না পারো এবং তুমি ধারণা করে থাকো যে, এ নিশ্চলতা দূর করার জন্য কোন বস্তুগত নিদর্শনের চাক্ষুস প্রদর্শনী অপরিহার্য, তাহলে তুমি নিজেই চেষ্টা করো, শক্তি ব্যবহার করো এবং ক্ষমতা থাকলে যমীনের মধ্যে সুড়ংগ কেটে বা আসমানে উঠে এমন কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার চেষ্টা করো, যা অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে দেবার জন্য যথেষ্ট বলে তুমি মনে করো। কিন্তু আমি তোমার এ বাসনা পূর্ণ করবো, এ ধরনের আকাংখা আমার ব্যাপারে পোষণ করো না। কারণ আমার পরিকল্পনায় এ ধরনের কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।

২৪. অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র সমস্ত মানুষকে কোন না কোনভাবে সত্যপন্থী বানানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কিতাব নাযিল করা, মুমিনদেরকে কাফেরদের মোকাবিলায় সংগ্রামরত করা এবং সত্যের দাওয়াতকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনের মনযিল অতিক্রম করাবার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহর একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ এ কাজটি এ পদ্ধতিতে করতে চান না। তিনি চান সত্যকে যুক্তি–প্রমাণ সহকারে লোকদের সামনে পেশ করতে। তারপর তাদের মধ্য থেকে যারা সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে সত্যকে চিনে নেবে, তারা নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তার প্রতি ঈমান আনবে। নিজেদের চরিত্রকে তার ছাঁচে ঢালাই করে বাতিল পূজারীদের মোকাবিলায় নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। নিজেদের শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন, উন্নত লক্ষ ও উদ্দেশ্য, উত্তম জীবনধারা এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যে মানব সমাজের সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সংগ্রাম চালিয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তনের পথ ধরে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার মনযিলে পৌছে যাবে। এ কাজে আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং যে পর্যায়ে তারা আল্লাহর কাছ থেকে যে ধরনের সাহায্য

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ
أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

সত্যের দাওয়াতে তারাই সাড়া দেয় যারা শোনে। আর মৃতদেরকে[২৫] তো আল্লাহ কবর থেকেই ওঠাবেন, তারপর তাদেরকে (তাঁর আদালতে হাযির হবার জন্য) ফিরিয়ে আনা হবে।

তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলো, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতায় ডুবে আছে।[২৬] ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলা কোন পাখিকেই দেখ না কেন, এরা সবাই তোমাদের মতই বিভিন্ন শ্রেণী। তাদের ভাগ্যলিপিতে কোন কিছু লিখতে আমি বাদ দেইনি।

লাভের যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারবে সে পর্যায়ে তাদেরকে সে সাহায্যও দিয়ে যেতে থাকবেন। কিন্তু যদি কেউ চায় এ স্বাভাবিক পথ পরিহার করে আল্লাহ নিছক তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির জোরে খারাপ চিন্তা নির্মূল করে মানুষের মধ্যে সুস্থ চিন্তার বিস্তার ঘটাবেন এবং অসুস্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করে সৎ ও সুস্থ জীবনধারা নির্মাণ করে দেবেন, তাহলে এমনটি কখনো হবে না। কারণ, যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মনীতির ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় একটি দায়িত্বশীল প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাকে কাজ করার ও আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা দিয়েছেন, আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দান করেছেন, পরীক্ষার অবকাশ দিয়েছেন এবং তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের জন্য ফায়সালার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২৫. যারা শোনে বলতে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যাদের বিবেক জীবন্ত ও জাগ্রত, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অচল করে দেয়নি এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ ও জড়তার তালা ঝুলিয়ে দেয়নি। পক্ষান্তরে মৃত হচ্ছে তারা যারা ভেড়ার পালের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে থাকে এবং প্রথম ভেড়াটির পথ ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তা দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্য হলেও।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ۭ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۭ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاۗءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

তারপর তাদের সবাইকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। কিন্তু যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে ডুবে আছে,[২৭] আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন।[২৮] এদেরকে বলো, একটু ভেবে চিন্তে বলতো দেখি, যদি তোমাদের ওপর কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বড় রকমের বিপদ এসে পড়ে অথবা শেষ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকো? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তখন তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাকো। তারপর তিনি চাইলে তোমাদেরকে সেই বিপদমুক্ত করেন। যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করতে তাদের কথা এ সময় একদম ভুলে গিয়ে থাকো।[২৯]

২৬. নিদর্শন বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মু'জিযা না দেখাবার কারণ এ নয় যে, আমি তা দেখাতে অক্ষম বরং এর কারণ অন্য কিছু। নিছক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তারা এটা বুঝতে পারছে না।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি নিছক তামাশা দেখার জন্য নয় বরং এ নবী যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা যথার্থই তা জানার জন্য নিদর্শন দেখতে চাও, তাহলে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল প্রাণীকূল এবং শূন্যে উড়ে চলা পাখিদের কোন একটি শ্রেণীকে নিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করো। দেখো, কীভাবে তাদেরকে অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাদের আকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। কীভাবে তাদের সৃষ্টিগত স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি ও সামর্থের সঞ্চার করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জীবিকা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা তার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যেতেও পারে না, পিছিয়ে আসতেও পারে না। কীভাবে তাদের এক একটি প্রাণীকে

এবং এক একটি ছোট ছোট কীট–পতংগকেও তার নিজের স্থানে সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথপ্রদর্শন করা হচ্ছে। কীভাবে একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তার থেকে কাজ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। কীভাবে তাকে একটি নিয়ম–শৃংখলার আওতাধীন করে রাখা হয়েছে। কীভাবে তার জন্ম, মৃত্যু ও বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা যথা নিয়মে চলছে। আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে যদি কেবলমাত্র এ একটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য যে কর্মনীতি অবলম্বন করার দিকে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তা–ই যথার্থ ও প্রকৃত সত্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের চোখ মেলে এগুলো দেখও না আর কেউ বুঝাতে এলে তার কথা মেনেও নাও না। তোমরা তো মুখ গুঁজে পড়ে আছো মূর্খতার নিকষ অন্ধকারে। অথচ তোমরা চাইছো আল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতার তেলেসমাতি দেখিয়ে তোমাদের মন মাতিয়ে রাখা হোক।

২৮. আল্লাহর বিপথগামী করার অর্থ হচ্ছে একজন মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। আর একজন পক্ষপাতদুষ্ট, বিদ্বেষী ও সত্যবিরোধী জ্ঞানান্বেষী কখনো আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেও সত্যের পক্ষে পৌঁছার নিশানীগুলো তার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে এবং বিভ্রান্তির অক্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার মতো জিনিসগুলো তাকে সত্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে। অপরদিকে আল্লাহর হেদায়াত তথা সত্য–সরল পথে পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি জ্ঞানের উপকরণসমূহ থেকে লাভবান হবার সুযোগ লাভ করে এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছার নিশানীগুলো লাভ করে যেতে থাকে। এ তিনটি অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায়ই আমাদের সামনে এসে থাকে। এমন বহু লোক আছে যাদের সামনে পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রাণীকূলের মধ্যে তাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তারা জন্তু–জানোয়ারের মতো সেগুলো দেখে থাকে এবং সেখান থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বহু লোক প্রাণীবিদ্যা (ZOOLOGY), উদ্ভিদ বিদ্যা (BOTANY), জীববিদ্যা (BIOLOGY), ভূতত্ত্ব (GEOLOGY), মহাকাশ বিদ্যা (ASTRONOMY), শরীর বিজ্ঞান (PHYSIOLOGY), শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (ANATOMY), এবং বিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ব্যাপক অধ্যয়ন করেন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন এবং এমন সব নিদর্শন তাদের সামনে আসে যেগুলো হৃদয়কে ঈমানের আলোয় ভরে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়নের সূচনা করেন এবং তাদের সামনে বৈষয়িক লাভ ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাই এ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণকালে তারা সত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছবার মতো কোন নিদর্শন পায় না। বরং তাদের সামনে যে নিদর্শনটিই উপস্থিত হয় সেটিই তাদেরকে নাস্তিকতা, আল্লাহ বিমুখতা, বস্তুবাদিতা ও প্রকৃতিবাদিতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মোকাবিলায় এমন লোকের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয় যারা সচেতন বুদ্ধি বিবেকের সাথে চোখ মেলে বিশ্ব প্রকৃতির এ সুবিশাল কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলে ওঠেন ঃ

"সচেতন দৃষ্টি সমুখে গাছের প্রতিটি সবুজ পাতা
একেকটি গ্রন্থ যেন স্রষ্টা–সন্ধানের এনেছে বারতা।"

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীর কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে বিপদ ও কষ্টের মুখে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা বিনীতভাবে আমার সামনে মাথা নত করে। কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো তখন তারা বিনম্র হলো না কেন? বরং তাদের মন আরো বেশী কঠিন হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা বিধান করেছে যে, তোমরা যা কিছু করছো ভালই করছো। তারপর যখন তারা তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছিল তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলো তখন অকস্মাত তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

২৯. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল, তোমরা একটি নিদর্শন নিয়ে আসার দাবী জানাচ্ছো অথচ তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এ প্রসংগে প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাণীদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করার আহবান জানানো হয়েছিল। এরপর এখন আর একটি নিদর্শনের দিকে ইংগিত করা হচ্ছে। এ নিদর্শনটি সত্য অস্বীকারকারীদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ কোন বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন হলে অথবা মৃত্যু তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে এক আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল তখন আর মানুষের চোখে পড়ে না। বড় বড় মুশরিকরা এ সময় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের কথা ভুলে এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কট্টর খোদাদ্রোহী নাস্তিকও এ সময় আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করে। এ নিশানীটিকে এখানে সত্যের নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহ ভক্তি ও তাওহীদের সাক্ষ প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। এর ওপর গাফলতি ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ পড়ুক না কেন তবুও তা কখনো না কখনো দৃষ্টি সমক্ষে জেগে ওঠে। আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা এ ধরনের নিশানী প্রত্যক্ষ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ
أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ
مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ
هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً
هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾

এ ভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের শিকড় কেটে দেয়া হলো। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য (কারণ তিনিই তাদের শিকড় কেটে দিয়েছেন।)।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[৩০] তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে যে এ শক্তিগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিশানীগুলো তাদের সামনে পেশ করি এবং এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে আযাব এসে যায় তাহলে জালেমরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?•

করেই ঈমানের সম্পদলাভে সক্ষম হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মক্কা বিজিত হবার পর ইকরামা জেদ্দার দিকে পালিয়ে যান। একটি নৌকায় চড়ে তিনি হাবশার (ইথিয়োপিয়ার) পথে যাত্রা করেন। পথে ভীষণ ঝড়–তুফানে তার নৌকা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রথমে দেবদেবীদের দোহাই দেয়া শুরু হয়। কিন্তু এতে তুফানের ভয়াবহতা কমে না বরং আরো বেড়ে যেতেই থাকে। যাত্রীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এবার নৌকা ডুবে যাবে। তখন সবাই বলতে থাকে, এখন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকলে চলবে না। একমাত্র তিনি চাইলে আমাদের বাঁচাতে পারেন। এ সময় ইকরামার চোখ খুলে যায়। তার মন বলে ওঠে, যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী না থেকে থাকে, তাহলে অন্য জায়গায়ই বা আর কেউ থাকবে কেন? একথাটাই তো আল্লাহর সেই নেক বান্দাটি আমাদের গত বিশ বছর থেকে বুঝাচ্ছেন আর আমরা খামখা তাঁর সাথে লড়াই করছি। এটি ছিল ইকরামার জীবনের সিদ্ধান্তকরী মুহূর্ত। সে মুহূর্তেই তিনি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেন, যদি এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই, তাহলে সোজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবো এবং তাঁর হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। পরে তিনি নিজের এ অংগীকার পূর্ণ করেন। ফিরে এসে তিনি কেবল

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

আমি যে রসূল পাঠাই তা তো কেবল এ জন্যই পাঠাই যে, তারা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী হবে। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নেবে এবং নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করবে তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে তাদেরকে নিজেদের নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়।"[৩১] তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?[৩২] তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?

মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং অবশিষ্ট জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেই কাটান।

৩০. এখানে হৃদয়ে মোহর মেরে দেবার মানে হচ্ছে চিন্তা ও অনুধাবন করার শক্তি কেড়ে নেয়া।

৩১. অজ্ঞ লোকেরা চিরকাল এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত চিন্তা পোষণ করে এসেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও তাঁর গভীর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে অবশ্যি মানবিক গুণাবলীর উর্ধে অবস্থান করতে হবে। তিনি অভিনব, বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। তাঁর হাতের একটি মাত্র ইশারায় পাহাড় সোনায় পরিণত হবে। তাঁর আদেশ দেবার সাথে সাথেই পৃথিবী ধন উদগীরণ করতে থাকবে। লোকদের ভূত-ভবিষ্যত তার সামনে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট থাকবে। হারানো জিনিস কোথায় আছে তিনি এক নিমেষে বলে দেবেন। রোগী মরে যাবে, না বেঁচে উঠবে এবং প্রসূতির পেটে ছেলে না মেয়ে আছে তা বলে দিতে তার একটুও বেগ পেতে হবে না। এ ছাড়া তাকে মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত হতে হবে। সে ব্যক্তি আবার কেমন করে

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৬ রুকু'

আর হে মুহাম্মাদ! তুমি এ অহীর জ্ঞানের সাহায্যে তাদেরকে নসিহত করো যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের সামনে কখনো এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যে, সেখানে তাদের সাহায্য–সমর্থন বা সুপারিশ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী) থাকবে না। হয়তো (এ নসিহতের কারণে সতর্ক হয়ে) তারা আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করবে।[৩৩] *আর যারা তাদের রবকে দিন–রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।*[৩৪] *তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তোমার ওপর নেই এবং তোমার কৃতকর্ম থেকেও কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে তুমি জালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।*[৩৫]

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করলো যে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করে এবং নিদ্রার শিকার হয়, যার স্ত্রী–পুত্র পরিবার আছে, নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাকে কেনাবেচা করতে হয়, কখনো ঋণ নিতে হয় এবং কখনো অভাবে–অনটনে চরম দূরাবস্থার শিকার হতে হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকদের মনেও এ ধরনের চিন্তা বিরাজ করতো। তারা তাঁর নবুওয়াতের দাবী শুনে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করতো। তাঁর কাছে অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করার দবী জানাতো। তাঁকে একজন সাধারণ পর্যায়ের মানুষ দেখে তারা আপত্তি করতো যে, এ আবার কেমন পয়গম্বর যিনি খাওয়া দাওয়া করছেন, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা নিয়ে থাকছেন এবং হাট–বাজারেও চলাফেরা করছেন? এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৩২. এর অর্থ হচ্ছে, আমি যে সত্যগুলো তোমাদের সামনে পেশ করছি, আমি নিজে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। সরাসরি আমার অভিজ্ঞতায় সেগুলো ধরা পড়েছে। অহীর মাধ্যমে

সেগুলোর সঠিক জ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমার সাক্ষ চাক্ষুস সাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তোমরা এ সত্যগুলোর ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ। তোমরা এ সত্যগুলো সম্পর্কে যেসব চিন্তা পোষণ করে থাকো তা নিছক আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনা ভিত্তিক অথবা সেগুলোর ভিত গড়ে উঠেছে নিছক অন্ধ অনুসরণের ওপর। কাজেই আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চক্ষুষ্মান ও অন্ধের পার্থক্য। তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ কারণেই। আমার কাছে আল্লাহর কোন গোপন ধনভাণ্ডার আছে অথবা আমি গায়েবের খবর জানি বা মানবিক দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত—এ জাতীয় কোন বৈশিষ্টের কারণে তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর চিন্তাই নেই এবং কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এমন কথা ভাবেও না, তাদের জন্য এ নসীহত কখনো ফলপ্রসূ হবে না। অনুরূপভাবে যারা এই ভিত্তিহীন ভরসায় জীবন যাপন করছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করুক না কেন আখেরাতে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও হবে না, কারণ তারা অমুকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছে। অমুক তাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা অমুক তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাদের ওপরও এর কোন প্রভাব পড়বে না। কাজেই এ ধরনের লোকদেরকে বাদ দিয়ে তুমি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করো যাদের মনে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার ভীতি বিরাজমান এবং তাঁর ব্যাপারে কোন মিথ্যা আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করে না। কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের ওপরই এ নসীহতের প্রভাব পড়তে পারে এবং তাদের সংশোধনের আশা করা যেতে পারে।

৩৪. কুরাইশদের বড় বড় সরদার এবং তাদের বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল তার একটি ছিল এই যে, আপনার চারদিকে আমাদের জাতির ক্রীতদাস, মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সমবেত হয়েছে। তারা এ বলে নিন্দা ও বিদ্রূপ করতোঃ দেখো, এ ব্যক্তির সাথীও জুটেছে কত বড় সব সম্ভ্রান্ত লোকেরা! বেলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব এরাই তার সাথী। আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিত করার জন্য কি এদের ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? তারপর তারা এ ঈমান গ্রহণকারীদের কেবল দূরবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হতো না, তাদের মধ্য থেকে যারা ইতিপূর্বে কোন নৈতিক দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তারও সমালোচনা করতো এবং বলতো, যারা গতকাল পর্যন্ত এমন ছিল এবং অমুক ব্যক্তি যে অমুক কাজটি করেছিল, এসব লোকই এই 'সম্মানিত দলের' অন্তরভুক্ত হয়েছে। এখানে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ নিজের দোষ–গুণ ও ভাল–মন্দের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দায়ী। এ ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কাজের জবাবদিহি করার জন্য তুমি দাঁড়াবে না এবং তোমার কাজের জবাবদিহি করার জন্যও তাদের কেউ দাঁড়াবে না। তোমার অংশের কোন নেকী তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এবং তাদের অংশের কোন গোনাহও তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবে না। এরপরও যখন তারা নিছক সত্যান্বেষী হিসেবে তোমার কাছে আসে তখন তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবে কেন?

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝ وَاِذَا جَاۗءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۗءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে এক দলকে আর এক দলের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি,[৩৬] যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, "এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?"—হাঁ, আল্লাহ কি তাঁর শোকরগুজার বান্দা কারা, সেটা এদের চাইতে বেশী জানেন না? আমার আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের রব দয়া ও অনুগ্রহের নীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অবলম্বন করেন, এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ।[৩৭] আর এভাবে আমি আমার নিশানীগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে অপরাধীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৮]

৩৬. অর্থাৎ সমাজের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী দরিদ্র, অভাবী ও কপর্দকহীনদেরকে সর্বপ্রথম ঈমান আনার সুযোগ দান করে আমি ধন ও বিত্তের অহংকারে মত্ত লোকদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি।

৩৭. যারা সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে বহু লোক এমনও ছিলেন, যারা জাহেলী যুগে বড় বড় গোনাহ করেছিলেন। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলেও ইসলাম বিরোধীরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের দোষ ও কার্যাবলীর জন্য তাদেরকে বিদ্রূপ করতো ও খোঁটা দিতো। এর জবাবে বলা হচ্ছে ঃ ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দাও। তাদেরকে বলো, যে ব্যক্তি তাওবা করে নিজের সংশোধন করে নেয় তার পেছনের গোনাহের জন্য তাকে পাকড়াও করা আল্লাহর রীতি নয়।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৭ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে ডাকো তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের ইচ্ছা–বাসনার অনুসরণ করবো না। এমনটি করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সরল–সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত থাকবো না। বলো, আমার রবের পক্ষ থেকে আমি একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা তাকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি আমার ক্ষমতার আওতাধীন নয়।[৩৯] *ফায়সালার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তিনিই সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী। বলো, তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি যদি আমার আওতার মধ্যে থাকতো তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু জালেমদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।*

৩৮. "এভাবে" শব্দটি বলে ইংগিত করা হয়েছে এ সমগ্র ধারাবাহিক ভাষণটির প্রতি—যেটি শুরু হয়েছে চতুর্থ রুকূ'র নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে ঃ "তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?" এর অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শনের পরও যারা নিজেদের কুফরী, অস্বীকার ও অবাধ্যতার ওপর জিদ ধরে চলছে, তাদের অপরাধী হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এ সংগে এ সত্যটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠছে যে, আসলে এসব লোক নিজেদের গোমরাহী প্রীতির কারণেই এ পথে চলছে। সত্যপথে চলার স্বপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি অথবা নিজেদের এ গোমরাহীর পক্ষেও তাদের কাছে কিছু দলীল–প্রমাণ আছে, এ কারণে তারা এ পথে চলছে না।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۶۰﴾

তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে। তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়–কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে।

৩৯. এখানে আল্লাহর আযাবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বিরোধীরা বলছিল, যদি তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমরা যেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে মিথ্যুক বলছি এবং তোমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছি সেখানে আল্লাহর আযাব আমাদের ওপর আপতিত হচ্ছে না কেন? তোমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হবার বিষয়টি একথা দাবী করে যে, কেউ তোমাকে মিথ্যুক বলার ও অবমাননা করার সাথে সাথেই মাটির বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে তার মধ্যে চাপা পড়ে যাবে অথবা সাথে সাথেই বজ্রপাত হবে এবং সে বজ্রাঘাতে সে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনছে তাদের ওপর বিপদের পরে বিপদ আসছে এবং তাদেরকে হেয় ও অপদস্থ করা হচ্ছে অথচ যারা তাদেরকে গালিগালাজ করছে এবং তাদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারছে তারা আরামে ও নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছে।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

৮ রুকূ'

তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান।[৪০] *অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না। তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান হয়ে যাও, ফায়সালা করার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র তিনিই এবং তিনি হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন।*

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, জল–স্থলের গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কার কাছে তোমরা কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা করো? কার কাছে বলে থাকো, এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যি তোমার শোকরগুজারী করবো?—বলো, আল্লাহ তোমাদের এ থেকে এবং প্রতিটি দুঃখ–কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এরপরও তোমরা অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো।[৪১]

৪০. অর্থাৎ এমন ধরনের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কথা এবং তৎপরতার ওপর, প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখে এবং তোমাদের প্রতিটি গতিবিধিকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে থাকে।

৪১. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই যে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল শক্তির অধিকারী, সমস্ত ইখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা যে, তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ, তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার যাবতীয় ক্ষমতা যে, তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই হাতে যে, রয়েছে তোমাদের

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

বলো, তিনি ওপর থেকে বা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের ওপর কোন আযাব নাযিল করতে অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে আর এক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম। দেখো, আমি কিভাবে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি, হয়তো তারা এ সত্যটি অনুধাবন করবে।[৪২] তোমার জাতি সেটি অস্বীকার করছে। অথচ সেটি সত্য। এদেরকে বলে দাও, আমাকে তোমাদের ওপর হাবিলদার নিযুক্ত করা হয়নি।[৪৩] প্রত্যেকটি খবর প্রকাশিত হবার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণাম জানতে পারবে।

আর হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি দেখো, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসংগে লিপ্ত হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়,[৪৪] তাহলে যখনই তোমার মধ্যে এ ভুলের অনুভূতি জাগে তারপর আর এ জালেম লোকদের কাছে বসো না।

ভাগ্যের চাবিকাঠি—এ সত্যগুলোর সাক্ষ তো তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। কোন কঠিন সংকটকাল এলে এবং যাবতীয় উপায় উপকরণ হাতছাড়া হতে দেখা গেলে তোমরা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর আশ্রয় চাও। কিন্তু এ সমস্ত দ্ব্যর্থহীন আলামত থাকা সত্ত্বেও তোমরা প্রভূত্বের ক্ষেত্রে কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করেছো। তাঁরই দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে অন্নদাতা

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন কিছুর দায়-দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বনকারীদের ওপর নেই। তবে নসীহত করা তাদের কর্তব্য। হয়তো তারা ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করা থেকে বেঁচে যাবে।[৪৫] যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তবে এ কুরআন শুনিয়ে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যাতে কোন ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, যখন আল্লাহর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য কোন রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি সে সম্ভাব্য সকল জিনিসের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় তাহলে তাও গৃহীত হবে না। কারণ, এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির বিনিময়ে তারা পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি আর ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

বলছো অন্যদেরকে। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করে অন্যদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী আখ্যা দিচ্ছো। তাঁর দাস হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্ব করছো। সংকট থেকে তিনিই উদ্ধার করেন এবং বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের দিনে তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করো কিন্তু তাঁর সহায়তায় সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার পর অন্যদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামে নযরানা দিতে থাকো।

৪২. আল্লাহর আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে অবস্থান করতে দেখার কারণে তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে চলছিল। তাই তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব আসতে একটুও দেরী

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকবো, যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ যখন আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তখন আবার কি আমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবো? আমরা কি নিজেদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো করে নেবো, যাকে শয়তানরা মরুভূমির বুকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং সে হয়রান, পেরেশান ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? অথচ তার সাথীরা তাকে চীৎকার করে ডেকে বলছে, এদিকে এসো, এখানে রয়েছে সোজা পথ? বলো, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হেদায়াত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দাও, নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

হয় না। একটি ঘূর্ণিঝড় অকস্মাত তোমাদের সবকিছু বরবাদ করে দিতে পারে। ভূমিকম্পের একটি মাত্র ঝট্‌কা তোমাদের সমগ্র জনপদকে ধূলিস্মাত করে দেবার জন্য যথেষ্ট। গোত্রীয় ও জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার বারুদে শুধু ছোট্ট একটু খানি আগুনের স্ফুলিংগ রেখে দিলেই তা এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রক্তপাত, বিশৃংখলা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। কাজেই আযাব আসছে না বলে তোমরা গাফলতির জোয়ারে বেহুঁশের মতো গা ভাসিয়ে দিয়ো না। তোমরা যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুল-নির্ভুল, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা ছাড়াই অন্ধের মতো জীবন পথে এগিয়ে চলো না। আল্লাহ তোমাদের অবকাশ দিয়েছেন এবং তোমাদের সামনে এমন সব নিশানী পেশ করছেন যার সাহায্যে তোমরা সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে পারবে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করো।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

তিনিই যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।[৪৬] আর যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হয়ে যাও, সেদিনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা যথার্থ অকাট্য সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে[৪৭] সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তাঁরই।[৪৮] তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[৪৯] সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো?[৫০] আমি তো দেখছি, 'তুমি ও তোমার জাতি প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।'' ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতাম।[৫১] আর এ জন্য দেখাতাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[৫২]

৪৩. অর্থাৎ তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো না তা জোর করে তোমাদের দেখিয়ে দেয়া এবং যা বুঝতে পারছো না তা জোর করে তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আর তোমরা না দেখলে ও না বুঝলে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এখন যদি তোমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হও তাহলে যে খারাপ পরিণতির ভয় তোমাদের দেখিয়ে আসছি তা যথা সময়ে তোমাদের সামনে এসে যাবে।

৪৪. অর্থাৎ যদি কখনো আমার এ নির্দেশ ভুলে যাও এবং ভুলবশত এ ধরনের লোকদের সাহচর্যে গিয়ে বসো।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করে কাজ করতে থাকে, নাফরমানদের কোন কাজের দায়–দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। সুতরাং নাফরমানদের সাথে তর্ক–বিতর্ক করে যেনতেন প্রকারে তাদের সমর্থন আদায় করতেই হবে এবং তাদের প্রত্যেকটি আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে আর তারা সত্যকে

স্বীকার না করলে কোন না কোনভাবে তাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিতেই হবে, এ ধরনের দায়িত্ব কেন তারা খামখা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে? তাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু, যাদেরকে ভুল পথে চলতে দেখবে তাদেরকে উপদেশ দেবে এবং সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে। তারপর যদি তারা সত্যকে না মানে এবং ঝগড়া–ঝাঁটি ও তর্ক–বিতর্ক করতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাদের সাথে অযথা বুদ্ধির লড়াই করে নিজের শক্তি ও সময় নষ্ট করা সত্যপন্থীদের কাজ নয়। এ ধরনের গোমরাহীর প্রেমে আকন্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তিদের পেছনে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে যারা নিজেরাই সত্যের সন্ধানে লিপ্ত তাদের শিক্ষা–দীক্ষা সংশোধন এবং উপদেশ দানে সত্যপন্থীদের সময় ব্যয় করা উচিত।

৪৬.. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে বা হকের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এ বাণীটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি নিছক খেলাচ্ছলে সাধিত হয়নি। এটি ঈশ্বরের বা ভগবানের লীলা নয়। এটি কোন শিশুর হাতের খেলনাও নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য কিছুক্ষণ খেলার পর শিশু অকস্মাত একে ভেঙ্গে চুরে শেষ করে ফেলে দেবে এমনও নয়। আসলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কাজটি করা হয়েছে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি বিরাট উদ্দেশ্য। এর একটি পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর এ পর্যায়ে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার হিসেব নেয়া এবং এই পর্যায়ের কাজের ফলাফলের ওপর পরবর্তী পর্যায়ের বুনিয়াদ রাখা স্রষ্টার জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কথাটিকেই অন্যান্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً "হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি।"

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেগুলোকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ –

"তোমরা কি ভেবেছো, আমি তোমাদেরকে এমনি অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না?"

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়নীতি, সূক্ষ্মদর্শীতা ও বিচক্ষণতা এবং সততার বিধান এর প্রতিটি জিনিসের পেছনে ক্রিয়াশীল। বাতিল ও অসত্যের জন্য শেকড় গাড়া ও ফলপ্রসূ হবার কোন অবকাশই এ অবকাঠামোতে নেই। অবশ্য বাতিলপন্থীরা যদি তাদের মিথ্যা, অন্যায় ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে চায়, তবে তাদেরকে সে জন্য চেষ্টা–সাধনা চালানোর কিছু সুযোগ আল্লাহ দিতেও

পারেন—সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিলের প্রতিটি বীজকে পৃথিবী উগরে ফেলে দেবে এবং শেষ হিসেব–নিকেশে প্রত্যেক বাতিলপন্থী দেখতে পাবে যে, এ নোংরা ও অবাঞ্ছিত বৃক্ষের চাষ করতে সে যত চেষ্টা চালিয়েছে, তার সবই বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ মহান আল্লাহ বিশ্ব–জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি হকের তথা নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব হক ও অধিকারের ভিত্তিতে তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর হুকুম এখানে এ জন্য চলে যে, তিনিই তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজত্ব করার অধিকার রাখেন। আপাত দৃষ্টিতে যদি অন্যদের রাজত্বও এখানে চলতে দেখা যায় তাহলে তাতে প্রতারিত হয়ো না। প্রকৃতপক্ষে তাদের হুকুম চলে না, চলতে পারেও না। কারণ এ বিশ্ব–জাহানের কোন জিনিসের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চালাবার কোন অধিকারই নেই।

৪৭. শিংগায় ফুঁক দেবার সঠিক স্বরূপ ও ধরনটা কি হবে তার বিস্তারিত চেহারা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কুরআন থেকে আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি তা কেবল এতটুকু যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর নাজানি কত সময় কত বছর চলে যাবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন, দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এর ফলে পূর্বের ও পরের এবং প্রথমের ও শেষের সবাই পুনর্বার জীবিত হয়ে নিজেদেরকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত দেখতে পাবে। প্রথম ফুঁকে বিশ্ব–জাহানের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, সবকিছু ওলট পালট ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে নতুন প্রকৃতি ও নতুন আইন কানুন নিয়ে আর একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮. এর অর্থ এ নয় যে, সেদিন রাজত্ব তাঁর হবে আর আজকে রাজত্ব তাঁর নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সেদিন যখন পর্দা উঠে যাবে, অন্তরাল সরে যাবে এবং প্রকৃত অবস্থা একেবারে সামনে এসে যাবে, তখন জানা যাবে, যাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতাশালী দেখা যেতো, তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন এবং যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করেছেন রাজত্ব করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের একমাত্র ও একচ্ছত্রভাবে তিনিই অধিকারী।

৪৯. সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে যা কিছু গোপন আছে তাই অদৃশ্য।

সৃষ্টির সামনে যা কিছু প্রকাশিত ও তার গোচরীভূত, তাই দৃশ্য।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী উল্লেখ করে এ বিষয়টির পক্ষে সমর্থন ও সাক্ষ পেশ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বদৌলতে যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা শিরককে অস্বীকার করেছেন এবং সকল কৃত্রিম ইলাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র বিশ্ব–জাহানের মালিক, স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামও করেছেন। আর যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছেন তাদের সাথে তাদের মূর্খ ও অজ্ঞ জাতি ঝগড়া ও বিতর্ক করছে ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথেও তার জাতি বাক–বিতণ্ডা করেছে। উপরন্তু ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতির জন্য রয়েছে সেই একই জওয়াব। নূহ, ইবরাহীম ও ইবরাহীমী বংশোদ্ভূত সমস্ত নবী যে পথে চলেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে একই পথে চলছেন। কাজেই এখন যারা তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করছে তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা নবীদের পথ থেকে সরে গিয়ে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে।

এ প্রসংগে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করতো। বিশেষ করে কুরাইশ বংশের লোকদের সমস্ত আভিজাত্যবোধের মূলে ছিল তাদের ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর হবার এবং তাঁর নির্মিত কাবাঘরের সেবক হবার অহংকার। তাই তাদের সামনে হযরত ইবরাহীমের তাওহীদ বিশ্বাস ও শিরক অস্বীকৃতি এবং মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর বিতর্কের উল্লেখ করার অর্থ ছিল যে জিনিস কুরাইশদের সমস্ত আভিজাত্য গৌরবের উৎস ছিল এবং মুশরিকী ও পৌত্তলিক ধর্মের ওপর আরবের কাফের সমাজের যে পরিপূর্ণ মনস্তুষ্টি ও তৃপ্তি ছিল তা ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদের ওপর একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, আজ মুসলমানরা ঠিক সেখানে অবস্থান করছে যেখানে ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন এবং তোমাদের অবস্থা এখন সেই পর্যায়ভুক্ত যে পর্যায়ে অবস্থান করছিল সেদিন হযরত ইবরাহীমের সাথে বিতর্ককারী তাঁর মূর্খ জাতি। এটা ঠিক তেমনি যেমন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত–অনুরক্ত ও কাদেরী বংশজাত পীরজাদাদের সামনে হযরত শায়খের আসল শিক্ষা ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পেশ করে কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে, যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তোমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করো তোমাদের নিজেদের নিয়ম–রীতি ও কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তোমাদের পীর ও মুরশিদ সারা জীবন যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন তোমরা আজ সেসব গোমরাহ লোকের পথ অবলম্বন করেছো।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের সামনে আজ যেমন বিশ্ব–জাহানের নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট এবং আল্লাহর নিশানীগুলো তোমাদর দেখানো হচ্ছে ঠিক তেমনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সামনেও এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোই ছিল। কিন্তু তোমরা এগুলো দেখার পরও এমন ভাব করছো যেন অন্ধের মতো কিছুই দেখতে পাও না। অথচ ইবরাহীম এগুলো দেখেছিলেন একজন সত্যিকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মতো বিস্ফারিত নেত্রে। এ একই সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন তোমাদের সামনে উদিত হচ্ছে। উদয়কালে এরা তোমাদের যেমন গোমরাহীতে লিপ্ত দেখে অস্তমিত হবার সময়ও ঠিক তেমনি একই অবস্থায় রেখে যায়। সে চক্ষুষ্মান মানুষটিও এদেরকে দেখেছিলেন এবং এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

৫২. কুরআনের এ আয়াতের বক্তব্য এবং হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বিতর্কের বিবরণ আরো যে সমস্ত আয়াতে এসেছে সেগুলো ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে হযরত ইবরাহীমের নিজ এলাকার সমকালীন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আধুনিক

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেবলমাত্র সেই শহরটিই আবিষ্কৃত হয়নি বরং ইবরাহীমের যুগে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা কেমন ছিল তার ওপরও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। স্যার লিওনার্ড উলী (SIR LEONARD WOOLLEY) তাঁর 'আব্রাহাম' (Abraham, London, 1935) গ্রন্থে এ গবেষণার যে ফল প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নীচে দেয়া হলো।

আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ সাধারণভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ২১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে হযরত ইবরাহীমের আবির্ভাব হয়। অনুমান করা হয়, এ সময় "উর" শহরের জনসংখ্যা ছিল আড়াই লাখ। পাঁচ লাখ থাকাটাও অসম্ভব নয়। এটি ছিল বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। একদিকে পামীর ও নীলগিরি পর্যন্ত এলাকা থেকে সেখানে পণ্য সম্ভার আমদানী হতো এবং অন্যদিকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তৃত ছিল। উর্ যে রাজ্যটির কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে পরিচিত ছিল তার সীমানা বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের উত্তর এলাকায় কিছু কম এবং পশ্চিম দিকে কিছু বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশের অধিকাংশ জনবসতি শিল্প ও ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ যুগের যে শিলালিপিগুলো পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। অর্থ উপার্জন করা এবং আরাম, আয়েশ ও বিলাস উপকরণ সংগ্রহ করাই ছিল তাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ। সুদী কারবার সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। জনগণ ছিল কঠোর ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন। প্রত্যেকে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং পরস্পরের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নিজেদের উপাস্য দেবতা ও 'ইলাহ'দের কাছে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু, আর্থিক সচ্ছলতা ও ব্যবসায়িক উন্নতি লাভের জন্য দোয়া করতো। দেশের জনগোষ্ঠী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(এক) আমীলু ঃ এরা ছিল উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। এদের অন্তরভুক্ত ছিল পূজারী পুরোহিত, পদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা।

(দুই) মিশকীনু ঃ ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর ও কৃষিজীবীরা এর অন্তরভুক্ত।

(তিন) আরদূ ঃ অর্থাৎ দাস।

এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীটি অর্থাৎ আমীলুরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী অধিকার ছিল অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাদের অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের মূল্যও ছিল অন্যদের চাইতে বেশী।

এহেন নাগরিক ও সামাজিক পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের জন্ম হয়। তালমূদে আমরা হযরত ইবরাহীম ও তার পরিবারের অবস্থার যে বর্ণনা পাই তা থেকে জানা যায়, তিনি আমীলু শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারী অফিসার। (সূরা বাকারা, ২৯০ টীকা দেখুন)

উর নগরীর শিলালিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার উপাস্য দেবতা ও খোদার নাম পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন শহরের খোদা ছিল বিভিন্ন। প্রত্যেক শহরের একজন বিশেষ রক্ষক খোদার

আসনে বসেছিল। তাকে নগরীর প্রভু, মহাদেব বা খোদাদের প্রধান মনে করা হতো। অন্যান্য মাবুদদের তুলনায় তার মর্যাদা হতো অনেক বেশী। উরের 'নগর প্রভু' ছিল 'নান্নার' (চন্দ্র দেব)। এ সম্পর্কের কারণে পরবর্তীকালের লোকেরা এ শহরের নাম দিয়েছে 'কামরীনা' বা 'চান্দ্র' শহর। দ্বিতীয় বড় শহর ছিল 'লারসা'। পরবর্তীকালে উরের পরিবর্তে এ শহরটি রাজধানী শহরে পরিণত হয়। এর 'নগর প্রভু' ছিল 'শামাস' (সূর্য দেব)। এসব বড় বড় খোদার অধীনে ছিল অনেক ছোট ছোট খোদা। এদের বেশীর ভাগ নেয়া হয়েছিল আকাশের গ্রহ–নক্ষত্র থেকে এবং কম সংখ্যক নেয়া হয়েছিল যমীন থেকে। লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন ছোটখাট প্রয়োজন এদের আওতাধীন মনে করতো। পৃথিবী ও আকাশের এসব দেবতার প্রতীকী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। বন্দনা, পূজাপাঠ, আরাধনা ও উপাসনার সমস্ত অনুষ্ঠান তাদের সামনে সম্পন্ন করা হতো।

উর নগরীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি বিশাল সুরম্য প্রাসাদে 'নান্নার' দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর কাছেই ছিল নান্নারের স্ত্রী 'নানগুল' এর মন্দির। নান্নার–এর মন্দির ছিল একটি রাজপ্রাসাদের মতো। একজন করে পূজারিনী প্রতি রাতে বিয়ের কণে সেজে তার শয়নগৃহে যেতো। মন্দিরে অসংখ্য নারী দেবতার নামে উৎসর্গীত ছিল। তারা ছিল দেবদাসী (RELIGIOUS PROSTITUTES)। দেবতার নামে নিজের কুমারীত্ব বিসর্জনকারী মহিলাকে অত্যন্ত সম্মানীয়া মনে করা হতো। অন্ততপক্ষে একবার "দেবতার উদ্দেশ্যে" নিজেকে কোন পর পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়া নারীর জন্য মুক্তির উপায় মনে করা হতো। অতপর একথা বলার তেমন কোন প্রয়োজন নেই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূজারীরাই এ ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তির ফায়দা লুটতো।

নান্নার কেবল দেবতাই ছিল না বরং ছিল দেশর সবচেয়ে বড় জমিদার, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী, সবচেয়ে বড় শিল্পপতি এবং দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শাসকও। বিপুল সংখ্যক বাগান, গৃহ ও বিপুল পরিমাণ জমি এই মন্দিরে নামে ওয়াকফ ছিল। এই বিরাট সম্পত্তির আয় ছাড়াও কৃষক, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী সবাই সব ধরনের শস্য, দুধ, সোনা, কাপড় এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র মন্দিরে নজরানা দিতো। এগুলো আদায় ও গ্রহণ করার জন্য মন্দিরে একটি কর্মচারী বাহিনী নিযুক্ত ছিল। মন্দিরের আওতাধীনে বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পক্ষ থেকে ব্যবসায়–বাণিজ্যেরও বিরাট কারবার চলতো। দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে পূজারীরাই এসব কাজ সম্পাদন করতো। এ ছাড়া দেশের বৃহত্তম আদালত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূজারী ছিল তার প্রধান বিচারপতি। তার ফায়সালাকে আল্লাহর ফায়সালা মনে করা হতো। দেশে রাজপরিবারের শাসনও ছিল নান্নার–এর অনুগ্রহ পুষ্ট। আসল বাদশাহ ছিল নান্নার আর দেশের শাসনকর্তা তার পক্ষ থেকে দেশ শাসন করতো। এ সম্পর্কের কারণে বাদশাহ নিজেও মাবুদদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতো এবং অন্যান্য খোদা ও দেবতাদের মতো তারও পূজা করা হতো।

হযরত ইবরাহীমের সময় উরের যে রাজপরিবারটি ক্ষমতাসীন ছিল তার প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল উরনাম্মু। খৃস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে তিনি একটি বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তার রাজ্যের সীমানা পূর্বে সোসা থেকে শুরু করে পশ্চিমে লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার নাম থেকেই এ পরিবারের নামকরণ হয় 'নাম্মু'। এটিই আরবীতে এসে 'নমরূদ'–এ পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরতের পর এ পরিবার ও এ জাতির ওপর

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

অতপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললো ঃ যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই। তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলো, বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললো ঃ আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলো তখন বললো ঃ এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়। কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[৫৩] আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।"

ধ্বংস নেমে আসে এবং এর ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রথমে ঈলামীরা উরকে ধ্বংস করে। তারা নান্নারের মূর্তি সহকারে নমরূদকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর লারসায় একটি ঈলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে উর এলাকা এর অধীনে শাসিত হতে থাকে। অবশেষে একটি আরব বংশজাত পরিবারের অধীনে ব্যাবিলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উর ও লারসা তাদের শাসনাধীনে চলে যায়। এ ধ্বংসলীলার পর নান্নারের সাথে সাথে উরের অধিবাসীদের বিশ্বাসেও ধস নামে। করণ নান্নার তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা এ দেশের লোকেরা কি পরিমাণ গ্রহণ করেছিল। তবে খৃস্টপূর্ব ১৯১০ সালে ব্যাবিলনের বাদশাহ 'হামুরাবি' (বাইবেলে উল্লেখিত আমুরাফীল) যে আইন সংকলন করেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ আইন রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবুওয়াতের প্রদীপ থেকে নির্গত কিছুটা আলো অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। এ আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত শিলালিপি আবিষ্কার করেন

খৃষ্টপূর্ব ১৯০২ সালে একজন ফরাসী প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধানী এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে C. H. W. John এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন The oldest code of law নামে। এ আইনের বহু মূলনীতি ও খুঁটিনাটি ধারা–উপধারা হযরত মূসার শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

এ পর্যন্তকার প্রত্নতাত্বিক গবেষণার উপরোক্ত ফলাফল যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এ থেকে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতির মধ্যে শিরক নিছক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং একটি পৌত্তলিক উপাসনা ও পূজাপাঠের সমষ্টি ছিল না বরং এ জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যবস্থাপনা শিরকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এর মোকাবিলায় হযরত ইবরাহীম তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার প্রভাব কেবল মূর্তিপূজার ওপরই পড়তো না বরং রাজ পরিবারের উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া, তাদের শাসন কর্তৃত্ব, পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সমগ্র দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এর আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ ছিল নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত সমাজের সমগ্র ইমারতটি গুড়িয়ে ফেলে তাকে নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। এ জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ এবং পূজারী ও নমরূদ সবাই একই সংগে একই সময়ে তাঁকে থামিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসে।

৫৩. নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হবার আগে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে প্রাথমিক চিন্তাধারার সাহায্যে মহাসত্যে পৌছে গিয়েছিলেন এখানে তার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্ক, নির্ভুল চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক ব্যক্তি যখন এমন এক পরিবেশে চোখ মেললেন যেখানে চারদিকে শিরকের ছড়াছড়ি, কোথাও থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করার মতো অবস্থা তাঁর নেই, তখন তিনি কিভাবে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তা থেকে সঠিক ও নির্ভুল যুক্তি–প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। ইতিপূর্বে ইবরাহীমের জাতির যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর একটু চোখ বুলালেই জানা যায় যে, ছোট বেলায় জ্ঞান হবার পর হযরত ইবরাহীম দেখেন তাঁর চারদিকে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির পূজার ধুম চলছে। তাই সত্যি এদের কেউ রব কিনা—এই প্রশ্নটি থেকে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি নিয়ে তিনি চিন্তা–ভাবনা করেন। অবশেষে নিজের জাতির সমস্ত রবকে একটি অমোঘ বিধানের আওতায় বন্দী দাসানুদাসের মতো আবর্তন করতে দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যাদের রব হওয়ার দাবী করা হয় তাদের কারোর মধ্যে রব হবার যোগ্যতার লেশমাত্রও নেই। রব মাত্র একজনই, যিনি এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বন্দেগী করতে সবাইকে বাধ্য করেছেন।

যে ধরনের বাচনভংগী প্রয়োগের মাধ্যমে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাধারণ লোকদের মনে এক প্রকার সন্দেহ জাগে। বলা হয়েছে ঃ যখন রাত হয়ে গেলো, সে একটি তারকা দেখলো আবার যখন তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। তারপর যখন

চাঁদ দেখলো এবং পরে তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। এরপর সূর্য দেখলো এবং যখন তাও ডুবে গেলো তখন এ কথা বললো। ঘটনা বর্ণনার এ পদ্ধতি একজন সাধারণ পাঠকের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, ছোটবেলায় জ্ঞান চক্ষু উন্মেলিত হবার পর থেকেই কি প্রতিদিন হযরত ইবরাহীম দিনের পরে রাত হতে দেখতেন না? তিনি কি প্রতিদিন সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের উদিত ও অস্তমিত হতে দেখতেন না? আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরই করেছেন। তাহলে এ ঘটনাটি এভাবে বলা হয়েছে কেন যে, রাত হলে এই দেখলেন এবং দিন হলে এই দেখলেন? যেন মনে হচ্ছে, এ বিশেষ ঘটনাটির আগে তাঁর এসব দেখার সুযোগ হয়নি। অথচ একথা মোটেই সত্য নয়। অনেকের কাছে এ সন্দেহের নিরসন এমনই অসাধ্য মনে হয়েছে যে, তারা এর জবাব দেবার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্ম ও প্রতিপালন সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক গল্প ফেঁদে বসা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখেননি। তাদের সেই গল্পে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইবরাহীমের জন্ম ও প্রতিপালন হয় একটি গুহার মধ্যে। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগে পর্যন্ত তাঁকে চন্দ্র, সূর্য, তারকার দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। অথচ কথা এখানে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। একথা বোঝার জন্য এ ধরনের গল্প তৈরী করার কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানী নিউটন সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ঘটনা, তিনি একদিন একটি বাগানে গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেন অকস্মাত তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লো কেন? এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘটনাটির পূর্বে নিউটন কি কখনো কোন জিনিস ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখেন নি? অবশ্যই দেখেছেন। বহুবার দেখেছেন। তাহলে কি কারণে সেই একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে আপেলটি মাটিতে পড়ার ঘটনা নিউটনের মনে এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যা ইতিপূর্বে প্রতিদিনে শত শত বার এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও তার মনে সৃষ্টি হয়নি? এর একমাত্র জওয়াব এই যে, চিন্তা-ভাবনাকারী ও অনুসন্ধানী মন সবসময় এক ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে একইভাবে আলোড়িত হয় না। অনেক সময়ই এমন হতে দেখা গেছে, একটি জিনিস মানুষ ক্রমাগতভাবে দেখতে থাকে কিন্তু তা তার মনকে কোনভাবে নাড়া দেয় না। কিন্তু অন্য এক সময় সেই একই জিনিস দেখে তার মনে হঠাৎ একটি প্রশ্ন জাগে এবং তার ফলে তার চিন্তাশক্তিগুলো একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অথবা প্রথম থেকে কোন একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে মনে খট্‌কা বা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রতিদিনকার বারবার দেখা একটি জিনিসের ওপর নজর পড়ার সাথে সাথেই জটিল গ্রন্থী উন্মোচনের সূত্র হাতে এসে যায় আর তারপর সবকিছু পানির মত তরল মনে হয়। হযরত ইবরাহীমের ঘটনাটিও এ ধরনেরই। রাত প্রতিদিন আসতো এবং চলেও যেতো। সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন চোখের সামনে উদিত ও অস্তমিত হতো। কিন্তু সেটি ছিল একটি বিশেষ দিন যেদিন একটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ হযরত ইবরাহীমের চিন্তা ও দৃষ্টিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করে যার ফলে অবশেষে তিনি মহান আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) কেন্দ্রীয় সত্যে পৌঁছতে সক্ষম হন। হতে পারে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন যে, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর জাতির সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে? আর এ অবস্থায় অকস্মাত আকাশের একটি নক্ষত্রের উদয়াস্ত তাঁর চিন্তার সমস্ত জট খুলে দিয়ে

وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললো : তোমারা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে সত্য–সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যি তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না?[৫৪] আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি? আমাদের এ দু'দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তালাভের অধিকারী? বলো, যদি তোমরা কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকো। আসলে তো নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদেরই জন্য এবং সত্য–সরল পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।[৫৫]

যায়। প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার এও হতে পারে, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ফলেই তাঁর মনে প্রথম চিন্তার উন্মেষ ঘটে।

এ প্রসংগে আর একটি প্রশ্নও দেখা দেয়। সেটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তারকা দেখে বলেন, এ আমার রব আবার যখন চাঁদ ও সূর্য দেখে তাদেরকেও নিজের রব বলে ঘোষণা দেন, সে সময় কি তিনি সাময়িকভাবে হলেও শিরকে লিপ্ত হননি? এর জওয়াব হচ্ছে, একজন সত্যসন্ধানী তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে পরিভ্রমণকালে মাঝপথে যেসব মনযিলে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য থামে, আসল গুরুত্ব সে মনযিলগুলোর নয় বরং আসল গুরুত্ব হচ্ছে সে গন্তব্যের, যে দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন এবং যেখানে গিয়ে তিনি অবস্থান করেন। মাঝখানের এ মনযিলগুলো অতিক্রম করা প্রত্যেক সত্যসন্ধানীর জন্য অপরিহার্য। সেখানে অবস্থান হয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে অবস্থান করা হয় না। মূলত এ অবস্থান হয় জিজ্ঞাসা সূচক ও প্রশ্নবোধক,

সিদ্ধান্তমূলক নয়। অনুসন্ধানী যখন এ মনযিলগুলোর কোনটিতে অবস্থান করে বলেন, "ব্যাপারটি এমন" তখন এটি মূলত তার শেষ সিদ্ধান্ত হয় না বরং তার একথা বলার উদ্দেশ্য হয়, জিজ্ঞাসা মূলক। অর্থাৎ "ব্যাপারটি কি এমন?" তারপর পরবর্তী অনুসন্ধানে এর নেতিবাচক জবাব পেয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাই পথের মাঝখানে যেখানে যেখানে থামেন সেখানেই তিনি সাময়িকভাবে কুফরী বা শিরক করেন একথা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে কোন প্রকার শিরকে লিপ্ত হননি।

৫৪. কুরআনের মূল আয়াতে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি গাফলতি ও ভুলের মধ্যে ডুবে ছিল তার হঠাৎ গাফলতি থেকে জেগে ওঠে যে জিনিস থেকে গাফেল হয়ে ছিল তার স্মরণ করা। তাই আমি أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ এর অনুবাদ করেছি ঃ "এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না" হযরত ইবরাহীমের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যা কিছু করছো তোমাদের আসল ও যথার্থ রব সে সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। তিনি সব জিনিসের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ সত্য অবগত হয়েও কি তোমরা সচেতন হবে না?

৫৫. এ সমগ্র ভাষণটি একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং তাদের আসল অপরাধ ছিল তারা আল্লাহর গুণাবলী এবং তার প্রভুত্বের অধিকারে অন্যদের শরীক করতো। প্রথমত হযরত ইবরাহীম নিজেই বলছেন ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করছো। দ্বিতীয়ত নিজের জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহর কথা বলার জন্য হযরত ইবরাহীম যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এ ধরনের পদ্ধতি একমাত্র এমন লোকদের জন্য অবলম্বিত হয় যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কাজেই কুরআনের যেসব তাফসীরকার এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য জায়গায় হযরত ইবরাহীম প্রসংগে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একথা বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিল এবং কেবলমাত্র নিজেদের মাবুদদেরকেই ইলাহী ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ অধিকারী মনে করতো, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।" এর মধ্যে জুলুম শব্দটি থেকে কোন কোন সাহাবীর ভুল ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় এর অর্থ গোনাহ, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ আসলে এখানে জুলুম মানে শিরক। কাজেই এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো ঃ যারা আল্লাহকে মেনে নেবে এবং নিজেদের এ মেনে নেবার মধ্যে কোন প্রকার মুশরিকী বিশ্বাস ও কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাবে না, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি একমাত্র তারাই লাভ করবে এবং একমাত্র তারাই সত্য সরল পথে অধিষ্ঠিত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি মজার কথা জানাও প্রয়োজন। এ ঘটনাটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মহান নবুওয়াতী জীবনের সূচনা বিন্দু। কিন্তু বাইবেলে এটি স্থান পেতে পারেনি। তবে তালমূদে এর উল্লেখ আছে। সেখানে এমন দু'টি কথা আছে, যা কুরআন থেকে ভিন্ন। একটি হচ্ছে, সেখানে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা করা হয়েছে

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

১০ রুকূ'

ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি–প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (সে সত্য পথ যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে (হোদায়াত দান করেছি)। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎ–কাজের বদলা দিয়ে থাকি। (তারই সন্তানদের থেকে) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ। (তারই বংশ থেকে) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ওপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি। তাছাড়া তাদের বাপ–দাদা, সন্তান সন্ততি ও ভ্রাতৃ সমাজ থেকে অনেককে আমি সম্মানিত করেছি, নিজের খেদমতের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছি এবং সত্য–সরল পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

সূর্য থেকে এবং তারকা পর্যন্ত পৌছার পর তাকে আল্লাহতে পৌছিয়ে শেষ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম সূর্যকে "এ আমার রব" বলার সাথে সাথে তার বন্দনাও করে ফেলেন। আর এভাবে চাঁদকে "এ আমার রব" বলার পর তারও বন্দনা করেন।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

এটি হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত, নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাকে এর সাহায্যে হেদায়াত দান করেন। কিন্তু যদি তারা কোন শির্‌ক করে থাকতো তাহলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেতো।[৮৬] তাদেরকে আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[৮৭] এখন যদি এরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন পরোয়া নেই) আমি অন্য এমন কিছু লোকের হাতে এ নিয়ামত সোপর্দ করে দিয়েছি যারা এগুলো অস্বীকার করে না।[৮৮] হে মুহাম্মাদ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।

৮৬. অর্থাৎ যে শিরকের মধ্যে তোমরা লিপ্ত রয়েছো তারাও যদি কোন পর্যায়ে এর মধ্যে লিপ্ত হতো তাহলে এ মর্যাদা তারা কোনক্রমেই লাভ করতে পারতো না। কোন ব্যক্তির পক্ষে দস্যুতা ও রাহাজানির কাজে সফলতা লাভ করে দুনিয়ায় একজন বিজেতা হিসেবে খ্যাত হওয়া সম্ভবপর ছিল। অথবা চরম অর্থলিপ্সার মাধ্যমে কারূনের সমান খ্যাতি অর্জন বা অন্য কোন উপায়ে দুনিয়ার অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের মধ্যে নামজাদা দুশ্চরিত্র হয়ে যাওয়াটাও সম্ভব ছিল। কিন্তু শিরক থেকে দূরে অবস্থান না করে এবং নির্ভেজাল আল্লাহ প্রীতির পথে অবিচল না থেকে কোন ব্যক্তিই এ হেদায়াতের ইমাম ও সৎলোকদের নেতা হবার মর্যাদা এবং সারা দুনিয়ার জন্য কল্যাণ, সততা ও সৎ বৃত্তির উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো না।

৮৭. এখানে নবীদেরকে তিনটি জিনিস দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক, কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর হেদায়াতনামা। দুই, হুকুম অর্থাৎ এ হেদায়াতনামার সঠিক জ্ঞান, তার মূলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্যাপারে প্রয়োগ করার যোগ্যতা এবং বিভিন্ন জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মত প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা। তিন, নবুওয়াত অর্থাৎ তিনি এ হেদায়াতনামা অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টিকে পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বশীল পদ ও মর্যাদা।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

১১ রুকূ'

তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি।[৫৯] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে মূসা যে কিতাবটি এনেছিল, যা ছিল সমস্ত মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনা, যাকে তোমরা খণ্ড বিখণ্ড করে রাখছো, কিছু দেখাও আর কিছু লুকিয়ে রাখো এবং যার মাধ্যমে তোমাদের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তোমাদেরও ছিল না, তোমাদের বাপ–দাদাদেরও ছিল না।—কে তা নাযিল করেছিল[৬০] কেবল এতটুকুই বলে দাও ঃ আল্লাহ, তারপর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, এ কাফের ও মুশরিকরা যদি আল্লাহর হেদায়াত ও পথ–নির্দেশনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে করুক। আমি ঈমানদারদের এমন একটি দল সৃষ্টি করে দিয়েছি যারা এ নিয়ামতের যথার্থ কদর করে ও মর্যাদা দেয়।

৫৯. আগের ধারাবাহিক বর্ণনা ও পরবর্তী জওয়াবী ভাষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি ছিল ইহুদীদের উক্তি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী ছিল, আমি নবী এবং আমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশ কাফের সম্প্রদায় এবং আরবের অন্যান্য মুশরিকরা এ দাবীর যথার্থতা অনুসন্ধান করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমরাও তো নবী–রসূলদের মানো, বলো সত্যিই কি এ ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে? এর জওয়াবে তারা যা বলতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কট্টর বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন জায়গায় সে কথাগুলো বলে বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করতো। তাই ইসলাম বিরোধীরা ইহুদীদের যে উক্তিটিকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করে তার জওয়াব দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাওরাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব বলে মানে, এমন একজন ইহুদী কেমন করে বলতে পারে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কিছুই নাযিল করেননি? কিন্তু এখানে এ প্রশ্নটি যথার্থ নয়। কারণ গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় মানুষ অন্যের সত্য বক্তব্য অস্বীকার করতে গিয়ে

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ
الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ
وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ
الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۚ
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

(সে কিতাবের মতো) এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (অর্থাৎ মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করবে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করে।[৬১] আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে অহী এসেছে অথচ তার ওপর কোন অহী নাযিল করা হয়নি অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এমন জিনিস নাযিল করে দেখিয়ে দেবো? হায়! তুমি যদি জালেমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকবে। "নাও, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও।" তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তারি শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।

এমন সব কথাও বলে ফেলে যা তার নিজের স্বীকৃত সত্যের পরিপন্থী হয়। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। ফলে বিরোধিতার জোশে তারা এমনই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতিবাদ করতে করতে তারা এক সময় মূল রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

(আর আল্লাহ বলবেনঃ) "দেখো এবার তোমরা ঠিক তেমনি নিসংগ ও একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে গেছো যেমনটি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, যা কিছু তোমাদের দুনিয়ায় দিয়েছিলাম তা সব তোমরা পেছনে রেখে এসেছো এবং এখন তোমাদের সাথে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে তোমাদের কার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে তাদেরও কিছুটা অবদান আছে। তোমাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যেসব ধারণা করতে তা সবই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।"

আর এখানে যে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো", এর অর্থ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কুশলতা বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার মূল্যায়ণে ভুল করেছে। যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে সত্যের জ্ঞান ও জীবন যাপনের জন্য পথ নির্দেশনা নাযিল করেননি, সে মানুষের কাছে অহী নাযিল হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং এটি আল্লাহর ক্ষমতার অবমূল্যায়ণ ও ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা সে মনে করে, আল্লাহ তো মানুষকে বুদ্ধির অস্ত্র ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু তার সঠিক পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করেননি বরং তাকে দুনিয়ার বুকে অন্ধের মতো কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং এটি আল্লাহর কুশলতা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬০. এ জওয়াবটি যেহেতু ইহুদীদেরকে দেয়া হচ্ছে তাই মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নাযিলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ তারা নিজেরাই এটা মানতো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল একথা যখন তারা স্বীকার করতো তখন তাদের একথাটিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করে যে, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাছাড়া এ থকে কমপক্ষে এতটুকু কথা তো অবশ্যি প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং ইতিপূর্বে হয়েছে।

৬১. মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও—এরি স্বপক্ষে দেয়া হয়েছে প্রথম যুক্তিটি। এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কালামটি নাযিল হয়েছে সেটি আল্লাহরই কালাম, এর স্বপক্ষে দেয়া হচ্ছে এ দ্বিতীয় যুক্তিটি। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

১২ রুকূ'

আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী।[৬২] তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে।[৬৩] এ সমস্ত কাজ তো আল্লাহই করেন, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে ছুটে চলছো? রাতের আবরণ দীর্ণ করে তিনিই ফোটান উষার আলো। তিনিই রাতকে করেছেন প্রশান্তিকাল। চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্তের হিসেব তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন। এসব কিছুই সেই জবরদস্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারীর নির্ধারিত পরিমাপ। আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমূদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম। দেখো, আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।[৬৪] আর তিনিই একটি মাত্র প্রাণসত্তা থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একটি অবস্থান স্থল এবং তাকে সোপর্দ করার একটি জায়গা। এ নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে।[৬৬]

এক ঃ এ কিতাবটি বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য এর মধ্যে সর্বোত্তম মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। এখানে নির্ভুল ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উপদেশ দেয়া হয়েছে, পাক-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মনতা, জুলুম, চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা ও অন্যান্য যেসব অসৎকর্ম তোমরা পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহে স্তূপীকৃত করে রেখেছো সেগুলো থেকে এ কিতাবটিকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্টেরও অধিকারী। এ গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এসব সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো,[৬৭] অথচ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা তৈরী করে ফেললো,[৬৮] অথচ এরা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার উর্ধে।

দুই ঃ এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ কিতাব সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোন হেদায়াত পেশ করে না বরং সেগুলোয় যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার প্রতি সমর্থন যোগায়।

তিন ঃ প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে এ কিতাবটিও সে একই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে গাফলতির নিঁদ থেকে জাগিয়ে সতর্ক করা এবং বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চার : মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দুনিয়া পূজারী ও প্রবৃত্তির লালসার দাসত্বে জীবন উৎসর্গকারী, এ কিতাব তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেনি বরং নিজের চারদিকে এমন সব লোককে সমবেত করেছে যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরো আগে চলে যায়। তারপর এ কিতাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তাদের জীবনে যে বিপ্লব আসে তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদেব আল্লাহ প্রীতির কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে। কোন মিথ্যাচারী ব্যক্তি যে কিতাব রচনা করেছে এবং নিজের রচনাকে আল্লাহর রচনা বলে চালিয়ে দেবার চরম ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তার সে কিতাব কি এহেন বৈশিষ্ট ও সুফলের অধিকারী হতে পারে?

৬২. অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরে শস্যবীজ ফাটিয়ে তার মধ্য থেকে অংকুর গজান।

৬৩. জীবিতকে মৃত থেকে বের করার অর্থ প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো। আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করার অর্থ জীবন্ত দেহ থেকে প্রাণহীন বস্তু বের করা।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহ যে মাত্র একজনই তার নিদর্শন। অন্য কেউ আল্লাহর গুণাবলীরও অধিকারী নয়, আল্লাহর ক্ষমতায়ও অংশীদার নয় এবং তাঁর প্রভুত্বের অধিকার লাভেরও যোগ্য নয়। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞদের পক্ষে এ সমস্ত নিদর্শন ও আলামাতের সাহায্যে প্রকৃত ও মূল সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৬৫. অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকেই মানব বংশ ধারার উৎপত্তি হয়।

৬৬. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি, তার মধ্যে আবার নারী–পুরুষের পার্থক্য, সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের বংশ বৃদ্ধি এবং মাতৃগর্ভাশয়ে বীর্যের মাধ্যমে মানব ভ্রূণের অস্তিত্ব সঞ্চারের পর থেকে পৃথিবীতে তার পদার্পণ পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এগুলোর মাধ্যমে সে ওপরে বর্ণিত প্রকৃত সত্যটি চিনতে পারবে। কিন্তু যারা যথার্থ বুদ্ধি–জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তারাই এসব নিশানী থেকে সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। দুনিয়ায় যারা পশুর মতো জীবন যাপন করে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তির পূজা এবং তার চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ, তারা এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে কিছুই পাবে না।

৬৭. অর্থাৎ তারা নিজেদের কল্পনা ও আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে এ সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে, এ বিশ্ব–জাহান পরিচালনা এবং মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গাগড়ায় আল্লাহর সাথে আরো অনেক গোপন সত্তার শরীকানা আছে। তাদের মধ্যে কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ ফসল উৎপাদনের দেবতা, কেউ ধন–দৌলতের দেবী, কেউ রোগের দেবী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের আরো বিভিন্ন দেবদেবী বিরাজ করছে। ভূত, প্রেত, শয়তান, রাক্ষস ও দেবদেবী সম্পর্কিত এ ধরনের নানান অর্থহীন বিশ্বাস দুনিয়ার বিভিন্ন মুশরিক জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছে।

৬৮. আরবের মূর্খ লোকরা ফেরেশতাদেরকে বলতো আল্লাহর মেয়ে। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিক জাতিরাও আল্লাহর বংশধারা চালিয়ে দিয়েছে। তারপর কল্পনার সাহায্যে তারা দেবদেবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা তৈরী করে ফেলেছে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১৩ রুকূ'

তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। তাঁর কোন সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোন জীবন সংগিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এ তো আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক। দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তরদৃষ্টির আলো এসে গেছে। এখন যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধ সাজবে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।[৬৯]

৬৯. এ বাক্যটি আল্লাহর কালাম হলেও নবীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কুরআন মজীদে বক্তার লক্ষ ও সম্বোধন বারবার পরিবর্তিত হয়। কখনো নবীকে সম্বোধন করা হয়, কখনো মুমিনদেরকে, কখনো আহলি কিতাবদেরকে, কখনো কাফের ও মুশরিকদেরকে, কখনো কুরাইশদেরকে, কখনো আরববাসীদেরকে আবার কখনো সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়। অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির হেদায়াত। অনুরূপভাবে সম্বোধনকারী ও বক্তাও বারবার পরিবর্তিত হয়। কোথাও বক্তা হন আল্লাহ নিজেই, কোথাও অহী বহনকারী ফেরেশতা, কোথাও ফেরেশতাদের দল, কোথাও নবী আবার ঈমানদাররা। অথচ এসব অবস্থায়ই সমস্ত কালামই একমাত্র আল্লাহরই কালাম হয়ে থাকে।

"আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই"—এ বাক্যের মানে হচ্ছে, তোমাদের কাছে আলো পৌছে দেয়াই শুধু আমার কাজ। তারপর চোখ খুলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। যারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে জোরপূর্বক তাদের চোখ খুলে দেবো এবং যা কিছু তারা দেখছে না তা তাদেরকে দেখিয়ে ছাড়বো, এটা আমার দায়িত্ব নয়।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾
اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

এভাবে আমার আয়াতকে আমি বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে থাকি। এ জন্য বর্ণনা করি যাতে এরা বলে, তুমি কারোর কাছ থেকে শিখে এসেছো এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চাই।[৭০] হে মুহাম্মাদ! সে অহীর অনুসরণ করো, যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ সে একক রব ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং এ মুশরিকদের পেছনে লেগে থেকো না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শিরক করতো না। তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও।[৭১] আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা, এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে।[৭২] আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি।[৭৩] তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

৭০. সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূতে যে কথা বলা হয়েছে সে একই কথা এখানেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ মশা, মাকড়শা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতংগের উপমা শুনে এগুলোর মাধ্যমে যে মহাসত্য উদঘাটন করা হয়েছে সত্য সন্ধানীরা তার নাগাল পেয়ে যায়। কিন্তু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার রোগে যারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা বিদ্রূপের সূরে বলতে থাকে, আল্লাহর কালামে এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসগুলোর উল্লেখের কী প্রয়োজন হতে পারে! এ বিষয়বস্তুটিকে এখানে অন্য একভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর এ কালামটি লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে যাচ্ছে। এক দল লোক এ কালাম শুনে বা পড়ে এর উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে এবং এর

মধ্যে যেসব জ্ঞান ও উপদেশের কথা বলা হয়েছে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে এগুলো শুনার পর আর একদল লোকের চিন্তা কালামের মূল বক্তব্যের দিকে না গিয়ে আর এক ভিন্নধর্মী অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এ নিরক্ষর ব্যক্তি এ ধরনের রচনা আনলো কোথা থেকে? আর যেহেতু বিরোধিতাসুলভ বিদ্বেষে তাদের অন্তর আগে থেকে আচ্ছন্ন থাকে, তাই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা বাদ দিয়ে বাকি সকল প্রকার সম্ভাবনাই তাদের মনে উঁকি দিতে থাকে। এগুলোকে তারা এমনভাবে বর্ণনা করতে থাকে যেন মনে হয় তারা এ কিতাবের উৎস সন্ধানে সফলকাম হয়ে গেছে।

৭১. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে আহবায়ক ও প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কোতোয়ালের দায়িত্ব নয়। লোকদের সামনে এ আলোকবর্তিকাটি তুলে ধরা এবং সত্যের পূর্ণ প্রকাশের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ত্রুটি না রাখাই তোমার কাজ। এখন কেউ এ সত্যটি গ্রহণ না করতে চাইলে না করুক। লোকদেরকে সত্যপন্থী বানিয়েই ছাড়তে হবে, এ দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। তোমার নবুওয়াতের প্রভাবাধীন এলাকার মধ্যে মিথ্যার অনুসারী কোন এক ব্যক্তিও থাকতে পারবে না, একথাটিকে তোমার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তরভুক্ত করা হয়নি। কাজেই অন্ধদেরকে কিভাবে চক্ষুষ্মান করা যায় এবং যারা চোখ খুলে দেখতে চায় না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়—এ চিন্তায় তুমি খামখা নিজের মন–মস্তিষ্ককে পেরেশান করো না। দুনিয়ায় একজনও বাতিলপন্থী থাকতে না দেয়াটাই যদি যথার্থই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ কাজটি তোমাদের মাধ্যমে করাবার আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর একটি মাত্র প্রাকৃতিক ইংগিতেই কি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী করার জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু সেখানে এটা আদতে উদ্দেশ্যের অন্তরভুক্তই নয়। সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্য থেকে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা বজায় রাখা, তারপর সত্যের আলো তার সামনে তুলে ধরে উভয়ের মধ্য থেকে কোনটিকে সে গ্রহণ করে তার পরীক্ষা করা। কাজেই যে আলো তোমাকে দেখানো হয়েছে তার উজ্জ্বল আভায় তুমি নিজে সত্য–সরল পথে চলতে থাকো এবং অন্যদেরকে সে পথে চলার জন্য আহবান জানাও। এটিই হচ্ছে তোমার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতই নগণ্য হোক না কেন তাদেরকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করো না। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পেছনে লেগে থেকো না। তারা যে অশুভ পরিণামের দিকে নিজেরাই চলে যেতে চায় এবং যাবার জন্য অতি মাত্রায় উদগ্রীব, সেদিকে তাদেরকে যেতে দাও।

৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের ইসলাম প্রচারের আবেগে তারা যেন এমনই লাগামহীন ও বেসামাল হয়ে না পড়ে যার ফলে তর্ক–বিতর্ক ও বিরোধের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে যেতে তারা অমুসলিমদের আকীদা–বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ ও উপাস্যদেরকে গালিগালাজ করে না বসে। কারণ, এগুলো তাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে তা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

এরা শক্ত কসম খেয়ে বলছে, যদি কোন নিদর্শন[৭৪] আমাদের সামনে এসে যায় তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, "নিদর্শন তো রয়েছে আল্লাহর কাছে"।[৭৫] আর তোমাদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এসে গেলেও এরা বিশ্বাস করবে না।[৭৬] প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।[৭৭] আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।

৭৩. এখানে আবার সে সত্যটিকে সামনে রাখতে হবে যেদিকে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যার মধ্যে আমি ইশারা করেছি। অর্থাৎ যেসব ঘটনা প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে সংঘটিত হয় আল্লাহ সেগুলোকে নিজের কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কারণ এ আইনগুলো তিনিই প্রবর্তন করেছেন এবং এগুলোর সাহায্যে যা কিছু ঘটে তাঁর হুকুমেই ঘটে। এগুলো বর্ণনা করার সময় তিনি বলে থাকেন ঃ আমি এমন করেছি আর অন্যদিকে আমরা মানুষেরা এগুলো বর্ণনা করার সময় বলি ঃ প্রকৃতিগতভাবে এমনটিই হয়ে থাকে।

৭৪. নিদর্শন মানে এমন কোন সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তিকে মেনে না নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

৭৫. অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ পেশ করার ও নিদর্শন তৈরী করে আনার ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র আল্লাহ এ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে দেখাতে পারেন, না চাইলে নাও দেখাতে পারেন।

৭৬. এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা অস্থির হয়ে এ আকাংখা পোষণ করতো এবং কখনো কখনো মুখেও এ ইচ্ছা প্রকাশ করতো যে, এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে যাক যা দেখে তাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ভাইয়েরা সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। তাদের এ আকাংখা ও ইচ্ছার জবাবে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের কেমন করে বুঝানো যাবে যে, এদের ঈমান আনা কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটার ওপর নির্ভরশীল নয়।

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১৪ রুকূ'

যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতেরাও তাদের সাথে কথা বলতে থাকতো এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও তাদের চোখের সামনে একসাথে তুলে ধরতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনতো না। তবে তারা ঈমান আনুক এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যি অন্য কথা[৭৮] কিন্তু বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞের মতো কথা বলে থাকে। আর এভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জিন জাতীয় শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো।[৭৯] তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না।[৮০] কাজেই তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, তারা মিথ্যা রচনা করতে থাকুক।

৭৭. অর্থাৎ যে মানসিকতার কারণে প্রথমবার তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল সে একই মানসিকতা তাদের মধ্যে এখনো কাজ করছে। তাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে এখনো কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যে বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে ও দৃষ্টির স্থূলতার শিকার হয়ে তারা সেদিন সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারেনি সে একই অবস্থা আজো তাদের ওপর চেপে বসে আছে।

৭৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ব্যবহার করে মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। এমতাবস্থায় তাদের সত্যপন্থী হবার কেবলমাত্র একটি পথ বাকি থাকে। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে যেমন প্রতিটি স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টিকে সত্যপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক তেমনি তাদের থেকেও স্বাধীন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে তাদেরকে সত্যপন্থী বানিয়ে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ যে কর্মকৌশলের ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এটি তার পরিপন্থী। কাজেই আল্লাহ সরাসরি তাঁর প্রকৃতিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে মুমিন বানিয়ে দেবেন, তোমাদের এ ধরনের আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭৯. অর্থাৎ আজ যদি মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের শয়তানরা একজোট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে তাহলে আশংকার কোন কারণ নেই। কারণ এটা কোন নতুন কথা নয়। শুধুমাত্র তোমার একার ব্যাপারে এমনটি ঘটছে না। প্রত্যেক যুগে এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী দুনিয়াবাসীকে সত্য পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছেন তখনই সমস্ত শয়তানী শক্তি তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

"চমকপ্রদ কথা" বলতে সত্যের আহবায়ক ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার জন্য তারা যেসব কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন এবং যে সমস্ত সন্দেহ সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। তারপর এ সমস্ত কথাকে সামষ্টিকভাবে ধোঁকা ও প্রতারণা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সত্য বিরোধীরা যেসব অস্ত্রই ব্যবহার করে বাহ্যত সেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সফল অস্ত্র মনে হলেও তা কেবল অন্যদের জন্যই নয়, তাদের নিজেদের জন্যও প্রকৃতপক্ষে একটি ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

৮০. এ ব্যাপারে আমরা আগে যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছি সেগুলো ছাড়াও এখানে এ সত্যটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটিকে উপেক্ষা করতে গেলে সাধারণভাবে অনেক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কোন জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমোদনক্রমে আত্মপ্রকাশ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট আছেন এবং তাকে পছন্দও করেন। আল্লাহ কোন ঘটনা সংঘটিত হবার অনুমতি না দিলে, তাঁর মহাপরিকল্পনায় তার সংঘটিত হবার অবকাশ না রাখলে এবং কার্যকারণসমূহকে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সংঘটিত করার অনুকূলে সক্রিয় না করলে দুনিয়ায় কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া কোন চোরের চুরি, হত্যাকারীর হত্যা, জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিপর্যয় এবং কাফের ও মুশরিকের কুফরী ও শিরক সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তির ঈমান ও তাকওয়াও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। দু' ধরনের ঘটনাই একইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রথম ধরনের ঘটনায় আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর দ্বিতীয় ধরনের ঘটনা তিনি পছন্দ করেন, ভালবাসেন এবং এর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। যদিও কোন বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই বিশ্ব-জাহানের মালিকের ইচ্ছা কাজ করছে তবুও আলো ও আঁধার, ভাল ও মন্দ এবং সংস্কার ও বিপর্যয়ের বিপরীতমুখী শক্তিগুলোর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষশীল হবার ফলেই এ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই এ বৃহত্তর কল্যাণের ভিত্তিতেই তিনি আনুগত্য ও অবাধ্যতা, ইবরাহিমী প্রকৃতি ও নমরূদী প্রকৃতি, মূসার স্বভাব ও ফেরাউনী স্বভাব এবং মানবিক স্বভাব ও শয়তানী স্বভাব উভয়কেই কাজ করার সুযোগ দেন। তিনি নিজের স্বাধীন চেতনা ও ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে (জিন ও মানুষ) ভাল ও মন্দের মধ্য থেকে কোন একটি বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা দান করেছেন। পৃথিবীর এ কর্মশালায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো ভাল কাজ করতে পারে এবং খারাপ কাজও করতে পারে। আল্লাহর মর্জী ও ইচ্ছা যত দূর সুযোগ দেয়, যতদূর তিনি অনুমোদন দান করেন ততদূর পর্যন্ত উভয় ধরনের কর্মীরা পার্থিব উপায়-উপকরণসমূহের

وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

(এসব কিছু আমি তাদেরকে এ জন্য করতে দিচ্ছি যে) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর এ (সুদৃশ্য) প্রতারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ুক, তারা এর প্রতি তুষ্ট থাকুক এবং যেসব দুষ্কর্ম তারা করতে চায় সেগুলো করতে থাকুক। এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।[৮১] আর যাদেরকে আমি (তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[৮২]

সমর্থন লাভ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে একমাত্র তারাই যারা ভাল ও কল্যাণের জন্য কাজ করে আর আল্লাহর বান্দা তাঁর প্রদত্ত নির্বাচনের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মন্দকে নয়, ভাল ও কল্যাণকে অবলম্বন করুক, এটাই আল্লাহ ভালবাসেন।

এ সংগে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, সত্যের দুশমনদের বিরোধিতামূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বারবার নিজের ইচ্ছার বরাত দেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, তোমাদের কাজের ধরন ফেরেশতাদের মতো নয়। ফেরেশতারা কোন প্রকার বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আল্লাহর হুকুম তামিল করছে। অন্যদিকে দুষ্কৃতিকারী ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে তোমাদের আসল কাজ। আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় তাদেরকেও কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন, যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে যাচ্ছে। আবার তোমরা যারা আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করেছো তাদেরকেও একইভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। অবশ্য তাঁর সন্তুষ্টি, হেদায়াত, সমর্থন ও সাহায্য–সহায়তার হাত প্রসারিত হয়েছে তোমাদের দিকেই, কারণ তিনি যে কাজ পছন্দ করেন তোমরা তাই করে যাচ্ছো। কিন্তু তোমরা এ আশা করো না যে, আল্লাহ তাঁর অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যারা ঈমান আনতে চায় না তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন অথবা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাংগ, তাঁর ফরমানসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

আর হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি দুনিয়ায় বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথায় চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো চলে নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এবং তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানই করে থাকে।[৮৩]

এমন সব শয়তানকে জোরপূর্বক সমস্ত পথ থেকে সরিয়ে দেবেন, যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও হাত-পায়ের শক্তি এবং নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণ সত্যের পথ রোধ করার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটা কখনো হবার নয়। যদি সত্যিই তোমরা সত্য, সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণের জন্য কাজ করার সংকল্প করে থাকো, তাহলে অবশ্যি তোমাদের মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের সত্যপ্রিয়তার প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় মুজিযা, কারামতি ও অলৌকিক ক্ষমতার জোরে যদি বাতিলকে নির্মূল ও হককে বিজয়ী করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো তোমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ নিজেই দুনিয়ার সমস্ত শয়তানকে নির্মূল করে কুফরী ও শিরকের সম্ভাবনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮১. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি এবং এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে এ বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ নিজের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে এ সত্যগুলো ব্যক্ত করে দিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সত্যপন্থীদেরকে স্বাভাবিক পথেই সত্যের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমি কি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান করবো, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করবে এবং এমন কোন মুজিযা পাঠাবে যার বদৌলতে এরা ঈমান আনতে বাধ্য হবে?

৮২. অর্থাৎ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার জন্য এসব কথাবার্তা আজ নতুন করে রচনা করা হয়নি যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে এবং নবীদের মিশন সম্পর্কে যারা অবগত তারা একথার সাক্ষ প্রদান করবে যে, যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা সবই অকাট্য, আদি, অকৃত্রিম ও চিরন্তন সত্য এবং তার মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

আসলে তোমার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে আর কে সত্য–সরল পথে অবিচল রয়েছে।

এখন যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তার গোশ্‌ত খাও।[৮৪]

৮৩. অর্থাৎ দুনিয়ার অধিকাংশ লোক নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে কেবলমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের আকীদা–বিশ্বাস, দর্শন, চিন্তাধারা, জীবন যাপনের মূলনীতি ও কর্মবিধান সবকিছুই ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আল্লাহর পথ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার পথ মাত্র একটিই। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ নিজে যে পথটি জানিয়ে দিয়েছেন—লোকেরা নিজেদের আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ভিত্তিতে নিজেরাই যে পথটি তৈরী করেছে, সেটি নয়। কাজেই দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক কোন্ পথে যাচ্ছে, কোন সত্য সন্ধানীর এটা দেখা উচিত নয়। বরং আল্লাহ যে পথটি তৈরী করে দিয়েছেন তার ওপরই তার দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা উচিত। এ পথে চলতে গিয়ে দুনিয়ায় যদি সে নিসংগ হয়ে পড়ে তাহলেও তাকে একাকীই চলতে হবে।

৮৪. দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ নিজেদের ধারণা, কল্পনা ও আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে যেসব ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং যেগুলো ধর্মীয় বিধি–নিষেধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পানাহার সামগ্রী সম্পর্কিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ জাতীয় বিধি–নিষেধের প্রচলন রয়েছে। অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হালাল গণ্য করেছে। অথচ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সেগুলো হারাম। আবার অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হারাম করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে যেসব পশু যবেহ করা হবে সেগুলোকে হারাম ঠাওরানো হয়েছে এবং আল্লাহর নাম না নিয়ে যেগুলো যবেহ করা হবে সেগুলোকে একেবারেই হালাল মনে করা হয়েছে। এ ধরনের নিদারুণ অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভংগীর ওপর অতীতেও কোন কোন দল জোর দিয়েছিল এবং বর্তমানেও দুনিয়ার একদল লোক জোর দিয়ে চলছে। এরি প্রতিবাদে আল্লাহ এখানে মুসলমানদেরকে বলছেন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে নিয়ে থাকো, তাহলে কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও বিদ্বেষমূলক রীতি–প্রথার প্রচলন রয়েছে সেগুলো পরিহার করো, আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে মানুষ নিজেই যেসব বিধি–নিষেধের প্রাচীর তৈরী করেছে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলো এবং আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন কেবল তাকেই হারাম মনে করো আর আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন কেবল তাকেই হালাল মনে করো।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

যে জিনিসের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।[৮৫] *অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জ্ঞান ছাড়া নিছক নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। তোমার রব এ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা প্রকাশ্য গোনাহসমূহ থেকে বাঁচো এবং গোপন গোনাহসমূহ থেকেও। যারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নিজেদের সব কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। আর যে পশুকে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি তার গোশ্‌ত খেয়ো না। এটা অবশ্যি মহাপাপ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ ও আপত্তির উদ্ভব ঘটায়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে।*[৮৬] *কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যি তোমরা মুশরিক হবে।*[৮৭]

৮৫. সূরা নাহ্‌লের ১১৫ আয়াত দেখুন। এ ইংগিত থেকে পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, সূরা নাহ্‌ল এ সূরাটির আগে নাযিল হয়েছিল।

৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, ইহুদী আলেমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার জন্য আরবের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদেরকে যেসব প্রশ্ন শেখাতো তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ "আল্লাহ যেগুলো হত্যা করেন সেগুলো হারাম হয়ে যায় আর তোমরা যেগুলো হত্যা করো সেগুলো

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি[৮৮] এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না?[৮৯] কাফেরদের জন্য তো এভাবেই তাদের কর্মকাণ্ডকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৯০] আর এভাবে প্রতিটি লোকালয়ে আমি অপরাধীদের লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল ছড়াতে পারে। আসলে নিজেদের প্রতারণার জালে তারা নিজেরাই আবদ্ধ হয় কিন্তু তারা এর চেতনা রাখে না।

হালাল হয়ে যায় এর কারণ কি?" তথাকথিত আহলি কিতাবদের কুটিল ও বক্র মানসিকতার এটি একটি নমুনা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ইহুদী আলেমরা এ ধরনের প্রশ্ন তৈরী করে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

৮৭. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্যদিকে আল্লাহ বিমুখ লোকদের বিধান অনুযায়ী চলা এবং তাদের নির্ধারিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই হচ্ছে শিরক। আর জীবনের সমগ্র বিভাগে আল্লাহর পূর্ণাংগ আনুগত্য কায়েম করার নামই তাওহীদ। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে যদি আকীদাগতভাবে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্যলাভের অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে তা হবে আকীদাগত শিরক। আর যদি কার্যত এমন লোকদের আনুগত্য করা হয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে নিজেরাই হুকুমকর্তা ও বিধি-নিষেধের মালিক হয়ে বসে তাহলে তা হবে কর্মগত শিরক।

৮৮. এখানে মৃত্যু বলা হয়েছে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও চেতনাবিহীন অবস্থাকে। আর জীবন বলতে জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারার অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে ভুল ও নির্ভুলের পার্থক্যবোধ নেই এবং যার সত্য-সরল পথের স্বরূপ জানা নেই, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে জীবন সম্পন্ন হলেও প্রকৃত সত্যের বিচারে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। সে অবশ্যি জীবন্ত প্রাণী কিন্তু জীবন্ত মানুষ নয়। জীবন্ত মানুষ একমাত্র তাকেই বলা যাবে যে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুলের চেতনা রাখে।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

তাদের সামনে কোন আয়াত এলে তারা বলে, "আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা মানবো না।"[৯১] *আল্লাহ নিজের রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে কিভাবে নেবেন তা তিনি নিজেই ভাল জানেন। এ অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও কূটকৌশলের অপরাধে আল্লাহর কাছে অচিরেই লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।*

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[৯২] *আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।*

৮৯. অর্থাৎ যে মানুষটি মানবিক চেতনা লাভ করেছে এবং জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় বাঁকা পথগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা সত্যের সোজা রাজপথটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার ব্যাপারে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, সে এমনসব চেতনাবিহীন লোকদের মতো দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, যারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথ হারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

৯০. অর্থাৎ যাদেরকে আলো দেখানো হয় এবং তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আর যাদেরকে সত্য–সরল পথের দিকে আহবান জানানো হয় এবং তারা সে আহবানে কর্ণপাত না করে নিজেদের বাঁকা পথেই চলতে থাকে, তাদের জন্য এটিই আল্লাহর বিধান যে, এরপর অন্ধকারই তাদের কাছে ভাল মনে হতে থাকবে। তারা অন্ধের মতো পথ হাতড়ে চলা এবং এখানে সেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া পছন্দ করবে। ঝোপ–ঝাড়

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ
وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ
اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ
اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তার নিদর্শনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে শান্তির আবাস[৯৩] এবং তিনি তাদের অভিভাবক। কারণ, তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে ঘেরাও করে একত্র করবেন সেদিন তিনি জিনদের[৯৪] সম্বোধন করে বলবেন, "হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষদেরকে অনেক বেশী তোমাদের অনুগামী করেছো।" মানুষদের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুব বেশী ব্যবহার করেছে[৯৫] এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।" আল্লাহ বলবেন, "বেশ, এখন আগুনই তোমাদের আবাস। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল।" তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিসন্দেহে তোমাদের রব জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।[৯৬] দেখো এভাবে আমি (আখেরাতে) জালেমদেরকে পরস্পরের সাথী বানিয়ে দেবো (দুনিয়ায় তারা এক সাথে মিলে) যা কিছু উপার্জন করেছিল তার কারণে।[৯৭]

তাদের চোখে বাগান এবং কাঁটা তাদের দৃষ্টিতে ফুল হয়ে দেখা দেবে। সব রকমের অন্যায়, অসৎকাজ ও ব্যভিচারে তারা আনন্দ পায়। প্রত্যেকটি নির্বুদ্ধিতাকে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধানলব্ধ কীর্তি মনে করে। প্রত্যেকটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর তারা

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ
ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾

১৬ রুকূ'

(এ সময় আল্লাহ তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করবেন) "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো?" তারা বলবে, "হাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি।[৯৮] *আজ দুনিয়ার জীবন এদেরকে প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু সেদিন এরা কাফের ছিল বলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে।*[৯৯]

এ আশায় আরো বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তৈরী হয়ে যায় যে, প্রথমবারে তো ঘটনাক্রমে জ্বলন্ত অংগারে হাত লেগেছিল কিন্তু এবারে আর কোন অনিশ্চয়তা নেই, এবারে একেবারে নির্ঘাৎ মনি-মুক্তো হাতে ঠেকবে।

৯১. অর্থাৎ রসূলদের কাছে ফেরেশতা এসেছে এবং তারা আল্লাহর পয়গাম এনেছে, রসূলদের এ দাবী আমরা মানি না। যতক্ষণ ফেরেশতারা সরাসরি আমাদের কাছে না আসে এবং "এটি আল্লাহর বাণী" একথা সরাসরি আমাদের না বলে ততক্ষণ আমরা ঈমান আনতে পারি না।

৯২. বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার মানে হচ্ছে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করা এবং যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর করে দেয়া।

৯৩. শান্তির ঘর মানে জান্নাত, যেখানে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ থেকে সংরক্ষিত এবং সব রকমের ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯৪. এখানে জিন বলতে শয়তান জিন বুঝানো হয়েছে।

৯৫. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং তার দ্বারা লাভবান হয়েছে। প্রত্যেকে অন্যকে প্রতারণা করে নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছে।

৯৬. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবার এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করার ইখতিয়ার রাখেন কিন্তু এ শাস্তি দেয়া ও মাফ করা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিছক খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে হবে না। বরং এর পেছনে থাকবে জ্ঞান ও ন্যায়সংগত কারণ। আল্লাহ সেই অপরাধীকে মাফ করবেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তার অপরাধের জন্য সে

ذٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(একথা প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ নেয়া হবে যে,) তোমাদের রব জনপদগুলোকে জুলুম সহকারে ধ্বংস করতেন না যখন সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য অবগত নয়।[১০০]

প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কার্য অনুযায়ী হয়। আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন। তোমার রব কারোর মুখাপেক্ষী নন এবং দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।[১০১] *তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে এবং তোমাদের জায়গায় তার পছন্দমত অন্য লোকদের এনে বসাতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের আবির্ভূত করেছেন অন্য কিছু লোকের বংশধারা থেকে।*

নিজে দায়ী নয়। তিনি তাকেই শাস্তি দেবেন যাকে শাস্তি দেয়া তিনি যুক্তিসংগত মনে করবেন।

৯৭. অর্থাৎ যেভাবে দুনিয়ায় গোনাহ ও অসৎকাজ করার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক ছিল ঠিক তেমনি আখেরাতেও শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক হবে।

৯৮. অর্থাৎ আমরা স্বীকার করছি, আপনার পক্ষ থেকে রসূলের পর রসূল এসেছেন। তারা প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে ক্রমাগতভাবে আমাদের অবহিত ও সতর্কও করেছেন। কিন্তু তাদের কথা না মেনে আমরা নিজেরাই ভুল করেছি।

৯৯. অর্থাৎ এরা বেখবর বা অজ্ঞ ছিল না বরং অস্বীকারকারী কাফের ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করবে, সত্য তাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম।

১০০. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর মোকাবিলায় এ মর্মে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ দিতে চান না যে, আপনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমাদের অবগত করেননি এবং আমাদের সঠিক পথ জানাবার কোন ব্যবস্থাও করেননি। ফলে অজ্ঞতাবশত আমরা যখন ভুল পথে চলতে শুরু করেছি অমনি আমাদের পাকড়াও করতে শুরু করেছেন। এ যুক্তি প্রদর্শনের পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন। এভাবে জিন ও মানব জাতিকে সত্যপথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত করেছেন। এরপর লোকেরা ভুল পথে চললে এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলে এর যাবতীয় দায়–দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়, আল্লাহর ওপর নয়।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ
شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১০২] আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার ক্ষমতা রাখো না। হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকো এবং আমিও নিজের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকি,[১০৩] শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে পরিণাম কার জন্য মংগলজনক হবে। তবে জালেম কখনো সফলকাম হতে পারে না, এটি একটি চিরন্তন সত্য।

এ লোকেরা[১০৪] আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্ট ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলছে, এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের বানানো আল্লাহর শরীকদের জন্য।[১০৫] তারপর যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়।[১০৬] কতই না খারাপ ফায়সালা করে এরা!

১০১. "তোমাদের রব কারো মুখাপেক্ষী নন।" অর্থাৎ তাঁর কোন কাজ তোমাদের জন্য আটকে নেই। তোমাদের সাথে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িত নেই। কাজেই তোমাদের নাফরমানীর ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। অথবা তোমাদের আনুগত্যের ফলে তিনি লাভবানও হবেন না। তোমরা সবাই মিলে কঠোরভাবে তাঁর হুকুম অমান্য করলে তাঁর বাদশাহী ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে এক বিন্দু পরিমাণ কমতি দেখা দেবে না। আবার সবাই মিলে তাঁর হুকুম মেনে চললে এবং তাঁর বন্দেগী করতে থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্যে এক বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে না। তিনি তোমাদের সেলামীর মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের মানত-নযরানারও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বিপুল ভাণ্ডার তোমাদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন এবং এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না।

"দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।" পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এখানে এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব তোমাদেরকে সত্য–সরল পথে চলার নির্দেশ দেন এবং প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ করেন। তাঁর এ আদেশ–নিষেধের অর্থ এ নয় যে, তোমরা সঠিক পথে চললে তাঁর লাভ এবং তোমরা ভুল পথে চললে তাঁর ক্ষতি। বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, সঠিক পথে চললে তোমাদের লাভ এবং ভুল পথে চললে তোমাদের ক্ষতি। কাজেই তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেন। তার সাহায্যে তোমরা উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। এর ফলে তোমরা নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা পাও। এগুলো তাঁর করুণা ও মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব কঠোরভাবে পাকড়াও করেন না। তোমাদের শাস্তি দেবার মধ্যে তাঁর কোন আনন্দ নেই। তোমাদের পাকড়াও করার ও আঘাত দেবার জন্য তিনি ওঁৎ পেতে বসে নেই। তোমাদের সামান্য ভুল হলেই অমনি তিনি তোমাদের ওপর চড়াও হবেন, তা নয়। আসলে নিজের সকল সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান। নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে তিনি চরম দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। মানুষের ব্যাপারেও তিনি এ নীতিই অবলম্বন করছেন। তাই তিনি একের পর এক তোমাদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করে যেতে থাকেন। তোমরা নাফরমানী করে যেতে থাকো, গোনাহ করতে থাকো, অপরাধ করতে থাকো, তাঁর দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে তাঁরই বিধান অমান্য করতে থাকো। কিন্তু তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আশ্রয় নেন এবং তোমাদের উপলব্ধি করার ও সংশোধিত হবার জন্য ছাড় ও অবকাশ দিয়ে যেতে থাকেন। অন্যথায় তিনি যদি কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন, তাহলে তোমাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য একটি জাতির উত্থান ঘটানো অথবা সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে আর একটি নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

১০২. অর্থাৎ কিয়ামত। তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে। শেষ বিচারের জন্য তাদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে।

১০৩. অর্থাৎ আমার বুঝাবার পরও যদি তোমরা না বুঝতে চাও এবং নিজেদের ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে বিরত না হও, তাহলে যে পথে তোমরা চলছো সে পথে চলে যেতে থাকো আর আমাকে আমার পথে চলতে দাও। এর পরিণাম যা কিছু হবে তা তোমাদের সামনেও আসবে এবং আমার সামনেও।

১০৪. ওপরের ভাষণটি এ বলে শেষ করা হয়েছিল যে, এরা যদি উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় এবং নিজেদের মূর্খতার ওপর জিদ চালিয়ে যেতেই থাকে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের পথে চলো এবং আমি আমার পথে চলি, তারপর একদিন কিয়ামত অবশ্যি আসবে, সে সময় এ কর্মনীতির ফল তোমরা অবশ্যি জানতে পারবে, তবে একথা ভালভাবে জেনে রাখো, সেখানে জালেমদের ভাগ্যে কোন সফলতা লেখা নেই। তারপর যে জাহেলিয়াতের ওপর তারা জোর দিয়ে আসছিল এবং যাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না, তার কিছুটা ব্যাখ্যা এখন

এখানে করা হচ্ছে। তাদের সামনে তাদের সে "জুলুমের" স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা কোন সফলতার মুখ দেখার আশা করতে পারে না।

১০৫. তারা একথা স্বীকার করতো, পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই গাছপালা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেন। তাছাড়া যেসব গবাদি পশুকে তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের স্রষ্টাও আল্লাহ। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ এই যেসব অনুগ্রহ করেছেন এগুলো তাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও করুণার ধারা বর্ষণকারী দেবদেবী, ফেরেশতা, জিন, তারকা ও পূর্ববর্তী সৎব্যক্তিবর্গের পবিত্র আত্মার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তারা নিজেদের ক্ষেতের ফসল ও গৃহপালিত পশু থেকে দু'টি অংশ উৎসর্গ করতো। একটি অংশ উৎসর্গ করতো আল্লাহর নামে। যেহেতু তিনিই এ ফসল ও পশু তাদেরকে দান করেছেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় অংশটি উৎসর্গ করতো নিজেদের গোত্র বা পরিবারের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোশক উপাস্যদের নযরানা হিসেবে। তাদের করুণা ও অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের এ জুলুমের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ বলেন, এসব গবাদি পশু আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমিই এগুলো তোমাদের দান করেছি, তাহলে এ জন্য অন্যদের কাছে নযরানা পেশ করছো কেন? যিনি তোমাদের প্রতি সরাসরি অনুগ্রহ ও করুণা করেছেন, তোমাদের সে মহান অনুগ্রহকারী সত্তার অনুগ্রহকে অন্যদের হস্তক্ষেপ, সহায়তা ও মধ্যস্থতার ফল গণ্য করা এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে সে মহান অনুগ্রহকারীর অধিকারের মধ্যে তাদেরকে শরীক করা কি নিমকহারামী নয়? তারপর ইংগিতে এ বলে তাদের পুনরায় সমালোচনা করেছেন যে, তারা আল্লাহর এই যে অংশ নির্ধারণ করেছে এও তাদের নিজেদের নির্ধারিত, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বিধায়কে পরিণত হয়েছে। নিজেরাই ইচ্ছামতো যে অংশটা চাচ্ছে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে আবার যে অংশটা চাচ্ছে অন্যদের জন্য নির্ধারণ করছে। অথচ এ দানের আসল মালিক ও সর্বময় অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এ দান থেকে কি পরিমাণ তাঁর জন উৎসর্গ করতে হবে এবং বাকি অংশের মধ্যে আর কার কার অধিকার আছে তা নির্ধারিত হতে হবে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মাধ্যমে। কাজেই তারা নিজেরা নিজেদের মনগড়া বাতিল পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য যে অংশ উৎসর্গ করে এবং যে অংশ গরীব ও অভাবীদের মধ্যে দান করে দেয়, তাও কোন সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহর দরবারে তার গৃহীত হবার কোন কারণ নেই।

১০৬. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্ধারণ করতো নানা ধরনের চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে তার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার কমতি করতে থাকতো এবং প্রত্যেকবার নিজেদের মনগড়া শরীকদের অংশ বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাতো, তাদের কর্মনীতির প্রতি এখানে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হতো যে, নিজেদের মনগড়া উপাস্যদের সাথে তাদের যে মানসিক যোগ আছে তা আল্লাহর সাথে নেই। যেমন আল্লাহর নামে যেসব শস্য বা ফল নির্ধারণ করা হতো তার মধ্য থেকে কিছু পড়ে গেলে তা মনগড়া মাবুদদের অংশে শামিল করা হতো। আর মনগড়া মাবুদদের অংশ থেকে কিছু পড়ে গেলে বা আল্লাহর অংশে পাওয়া গেলে তা আবার মনগড়া মাবুদদের অংশে ফেরত দেয়া হতো। শস্য ক্ষেত্রের যে অংশ মনগড়া মাবুদদের নযরানার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেদিক থেকে যদি আল্লাহর

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

আর এভাবেই বহু মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা নিজেদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভন করে দিয়েছে,[১০৭] যাতে তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করতে[১০৮] এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে সংশয়িত করে তুলতে পারে।[১০৯] আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় ডুবে থাক।[১১০]

নযরানার জন্য নির্দিষ্ট অংশের দিকে পানির ধারা প্রবাহিত হতো তাহলে তার সমস্ত ফসল মনগড়া মাবুদদের অংশে দিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনা ঘটলে আল্লাহর অংশে কোন বৃদ্ধি করা হতো না। কোন বছর দুর্ভিক্ষের কারণে যদি নযরানার ফসল খেয়ে ফেলার প্রশ্ন দেখা দিতো, তাহলে আল্লাহর ভাগের ফসল খেয়ে ফেলা হতো। কিন্তু মনগড়া শরীকদের ভাগের ফসলে হাত লাগানো হতো না। ভয় করা হতো, এ অংশে হাত দিলে কোন বালা–মুসিবত নাযিল হয়ে যাবে। কোন কারণে শরীকদের অংশ কম হয়ে গেলে আল্লাহর অংশ থেকে কেটে তা পূরণ করে দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহর অংশ কম হয়ে গেলে শরীকদের অংশ থেকে একটি দানাও সেখানে ফেলা হতো না। এ কর্মনীতির সমালোচনা করা হলে নানা ধরনের মুখরোচক ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হতো। যেমন বলা হতো, আল্লাহ তো কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অংশ কিছু কম হয়ে গেলেও তাঁর কোন পরোয়া নেই। আর শরীকরা তো আল্লাহর বান্দা। তারা আল্লাহর মতো অভাবহীন নয়। কাজেই তাদের ওখানে সামান্য কমবেশী হলেও তারা আপত্তি জানায়।

এ কাল্পনিক ধারণা ও কুসংস্কারগুলোর মূল কোথায় প্রোথিত ছিল তা বুঝার জন্য এটা জানা প্রয়োজন যে, আরবের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ধন–সম্পদ থেকে আল্লাহর জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা গরীব মিসকীন, মুসাফির, এতীম ইত্যাদির সাহায্যের কাজে ব্যয়িত হতো। আর মনগড়া শরীকদেরকে নযরানা দেবার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা হয় সরাসরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পেটে চলে যেতো অথবা পূজার বেদীমূলে অর্ঘরূপে পেশ করা হতো এবং এভাবে তাও পরোক্ষভাবে পূজারী ও সেবায়েতদের ঝুলিতে গিয়ে পড়তো। এ জন্যই শত শত বছর ধরে এ স্বার্থ শিকারী ধর্মীয় নেতারা ক্রমাগতভাবে উপদেশ দানের মাধ্যমে অজ্ঞ জনতার মনে একথা বসিয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহর অংশে কিছু কম হয়ে গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু "আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের" অংশে কিছু কম হওয়া উচিত নয় বরং সম্ভব হলে সেখানে কিছু বেশী হতে থাকাটাই ভালো।

১০৭. এখানে শরীকরা শব্দটি আগের অর্থ থেকে পৃথক অন্য একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরের আয়াতে "শরীক" শব্দটি থেকে তাদের এমন সব মাবুদদেরকে বুঝানো

হয়েছিল যাদের বরকত, সুপারিশ বা মাধ্যমকে তারা নিয়ামত ও অনুগ্রহলাভের কাজে সাহায্যকারী মনে করতো এবং তাদের নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতালাভের অধিকারের ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো। অন্যদিকে এ আয়াতে শরীক বলতে মানুষ ও শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সন্তান হত্যাকে তাদের দৃষ্টিতে একটি বৈধ ও পছন্দনীয় কাজে পরিণত করেছিল। তাদেরকে শরীক বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যেভাবে পূজা ও উপাসনালাভের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ অনুরূপভাবে বান্দাদের জন্য আইন প্রণয়ন এবং বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণ করার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে পূজা ও উপাসনার কোন অনুষ্ঠান করা যেমন তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমার্থক ঠিক তেমনি কারোর মনগড়া আইনকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করা এবং তার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করাকে অপরিহার্য মনে করাও তাকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে শরীক গণ্য করারই শামিল। এ দু'টি কাজ অবশ্যি শিরক। যে ব্যক্তি এ কাজটি করে, সে যাদের সামনে মানত ও নযরানা পেশ করে অথবা যাদের নির্ধারিত আইনকে অপরিহার্যভাবে মেনে চলে, তাদেরকে মুখে ইলাহ বা রব বলে ঘোষণা করুক বা না করুক তাতে এর শিরক হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

আরববাসীদের মধ্যে সন্তান হত্যা করার তিনটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কুরআনে এ তিনটির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

এক ঃ মেয়ের কারণে কোন ব্যক্তিকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অথবা গোত্রীয় যুদ্ধে শত্রুরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বা অন্য কোন কারণে তার জন্য পিতামাতাকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে—এসব চিন্তায় মেয়েদের হত্যা করা হতো।

দুই ঃ সন্তানদের লালন পালনের বোঝা বহন করা যাবে না এবং অর্থনৈতিক উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের দরুন তারা দুর্বিসহ বোঝায় পরিণত হবে—এ ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা হতো।

তিন ঃ নিজেদের উপাস্যদের সন্তুষ্টির জন্য সন্তানদের বলি দেয়া হতো।

১০৮. এ "ধ্বংস" শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ ঃ নৈতিক ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নির্মমতা ও হৃদয়হীনতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে নিজের সন্তানকে নিজের হাতে হত্যা করতে থাকে, তার মধ্যে মানবিক গুণ তো দূরের কথা পাশবিক গুণেরও অস্তিত্ব থাকে না। আবার এর অর্থ ঃ সম্প্রদায়গত ও জাতীয় ধ্বংসও হয়। সন্তান হত্যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বংশ হ্রাস ও জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে। এর ফলে মানব সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিও ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে থাকে। কারণ এ জাতি নিজেদের সাহায্য, সহায়তা ও সমর্থন দানকারী, নিজেদের তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্মের পথ রুদ্ধ করে অথবা জন্মের পরপরই নিজেরাই নিজেদের হাতে তাদেরকে খতম করে দেয়। এ ছাড়া এর অর্থ পরিণামগত ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নিরপরাধ-নিষ্পাপ শিশুদের ওপর এ ধরনের জুলুম করে, নিজের মনুষ্যত্বকে এমনকি প্রাণী-সুলভ প্রকৃতিকেও এভাবে জবাই করে এবং মানব সম্প্রদায়ের সাথে ও নিজের জাতির সাথেও এ ধরনের শত্রুতা করে, সে নিজেকে আল্লাহর কঠিনতম আযাবের উপযোগী করে তোলে।

وَقَالُوا۟ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

তারা বলে, এ পশু ও এ ক্ষেত-খামার সুরক্ষিত। এগুলো একমাত্র তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাই। অথচ এ বিধি-নিষেধ তাদের মনগড়া।[১১১] তারপর কিছু পশুর পিঠে চড়া ও তাদের পিঠে মাল বহন করা হারাম করে দেয়া হয়েছে আবার কিছু পশুর ওপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না[১১২] আর এসব কিছু আলাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা রটনা।[১১৩] শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল দেবেন।

১০৯. জাহেলী যুগের আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের অনুসারী মনে করতো এবং এ হিসেবে নিজেদের পরিচয়ও দিতো। এ জন্য তাদের ধারণা ছিল, তারা যে ধর্মের অনুসরণ করছে সেটি আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছ থেকে যে জীবন বিধানের শিক্ষা তারা নিয়েছিল তার মধ্যে পরবর্তী বিভিন্ন শতকে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, গোত্রীয় সরদার, পরিবারের বয়োবৃদ্ধ এবং অন্যান্য লোকেরা নানান ধরনের বিশ্বাস ও কর্মের সংযোজন ঘটিয়েছে। পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলোকেই আসল দীন ও জীবন বিধানের অংশ মনে করেছে এবং ভক্তি সহকারে সেগুলো মেনে চলেছে। যেহেতু জাতীয় ঐতিহ্যে, ইতিহাসে বা কোন গ্রন্থে এমন কোন রেকর্ড সংরক্ষিত ছিল না, যা থেকে আসল ধর্ম কি ছিল এবং পরবর্তীকালে কোন্ সময় কে কোন্ বিষয়টি তাতে বৃদ্ধি করেছিল, তা জানা যেতে পারে, তাই আরববাসীদের জন্য তাদের সমগ্র দীনটিই সন্দেযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কোন বিষয় সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারতো না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আসল দীনটি এসেছিল এটি তার অংশ এবং এ বিদআত ও ভুল রসম-রেওয়াজ- অনুষ্ঠানগুলো পরবর্তীকালে এর সাথে সংযুক্ত ও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বাক্যটির মধ্যে এ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ যদি আল্লাহ চাইতেন তারা এমনটি না করুক তাহলে তারা কখনই এমনটি করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু যে ব্যক্তি যে পথে চলতে চায় তাকে সে পথে চলতে দেয়াটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা তাই এসব কিছু হয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের বুঝাবার পর এরা না মানে এবং নিজেদের মিথ্যাচার ও মিথ্যা রচনার ওপর তারা জোর দিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা যা করতে চায় করতে দাও। তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

১১১. আরববাসীদের রীতি ছিল, তারা কোন কোন পশু বা কোন কোন ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল এভাবে মানত করতো ঃ এটি অমুক মন্দির, অমুক আস্তানা বা অমুক হযরতের নযরানা। এ নযরানা সবাই খেতে পারতো না। বরং এর সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত বিধান

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

আর তারা বলে, এ পশুদের পেটে যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয় তাহলে উভয়েই তা খাবার ব্যাপারে শরীক হতে পারে।[১১৪] *তাদের এ মনগড়া কথার প্রতিফল আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যি দেবেন। অবশ্যি তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।*

নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনোই সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[১১৫]

তাদের কাছে ছিল। এ বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লোকের জন্য বিভিন্ন নযরানা নির্দিষ্ট ছিল। তাদের এ কাজটিকে আল্লাহ কেবল মুশরিকী কাজ বলেই ক্ষান্ত হননি বরং এ ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এটি তাদের একটি মনগড়া বিধান। অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের মধ্যে এ নযরানাগুলো নির্দিষ্ট করা হয় এবং মানত মানা হয় তিনি এ নযরানা দেবার ও মানত মানার হুকুম দেননি এবং তিনি এগুলো ব্যবহার করার ওপর এ ধরনের কোন বিধি-নিষেধও আরোপ করেননি। এসব কিছুই এ অহংকারী ও বিদ্রোহী বান্দাদের মনগড়া রচনা।

১১২. হাদীস থেকে জানা যায়, আরববাসীরা কিছু কিছু বিশেষ নযরানা ও মানতের পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জায়েয মনে করতো না। এ পশুগুলোর পিঠে চড়ে হজ্জ করাও নিষিদ্ধ ছিল। কারণ হজ্জের জন্য লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলতে হতো। অনুরূপভাবে এগুলোর পিঠে সওয়ার হবার সময়, এদের দুধ দোয়ার সময়, যবেহ করার সময় অথবা এদের গোশ্‌ত খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম যাতে উচ্চারিত না হয় তার ব্যবস্থা করা হতো।

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

১৭ রুকূ'

তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম[১১৬] ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আবার তিনিই গবাদি পশুর মধ্যে এমন পশুও সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাহায্যে যাত্রী ও ভারবহনের কাজ নেয়া হয় এবং যাদেরকে খাদ্য ও বিছানার কাজেও ব্যবহার করা হয়।[১১৭] খাও এ জিনিসগুলো থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১৮]

১১৩. অর্থাৎ এ নিয়মগুলো আল্লাহ নির্ধারিত নয়। কিন্তু এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এ মনে করেই তারা এগুলো মেনে চলছে। কিন্তু এ ধরনের কথা মনে করার স্বপক্ষে তাদের কাছে আল্লাহর হুকুমের কোন প্রমাণ নেই বরং কেবল বাপ-দাদাদের থেকে এমনটি চলে আসছে, এ সনদই আছে তাদের কাছে।

১১৪. মানত ও নযরানার পশুর ব্যাপারে যে মন গড়া বিধান আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তার একটি ধারা এও ছিল যে, এ পশুগুলোর পেট থেকে যেসব বাচ্চা জন্মায় কেবলমাত্র পুরুষরাই তাদের গোশ্‌ত খেতে পারে। মেয়েদের জন্য তাদের গোশ্‌ত খাওয়া নাজায়েয। তবে যদি সে বাচ্চা মৃত হয় অথবা মরে যায় তাহলে পুরুষরা ও মেয়েরা সবাই তার গোশ্‌ত খেতে পারে।

১১৫. অর্থাৎ যদিও এ রীতি-পদ্ধতিগুলো যারা রচনা করেছিল তারা ছিল তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ, তোমাদের নেতা ও সরদার কিন্তু এ সত্ত্বেও সত্য যা

তা চিরকালই সত্য। তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ এবং তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ ছিল বলেই তাদের উদ্ভাবিত ভুল পদ্ধতিগুলো সঠিক ও পবিত্র হয়ে যাবে না। যেসব জালেম সন্তান হত্যার মতো জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজকে রেওয়াজে পরিণত করেছিল, যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে খামখা আল্লাহর বান্দাদের জন্য হারাম করেছিল এবং যারা আল্লাহর দীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন নতুন কথা শামিল করে সেগুলোকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছিল তারা কেমন করে সঠিক পথ পেতে ও সফলকাম হতে পারে? তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ ও বুযর্গ হলেও আসলে তারা গোমরাহ ছিল। তাদের অবশ্যি নিজেদের গোমরাহীর অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হতেই হবে।

১১৬. আয়াতের মূল শব্দ হচ্ছে جَنّٰتٍ مَّعْرُوشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوشٰتٍ । এর অর্থ হচ্ছে দু' ধরনের বাগান। এক ধরনের বাগান হচ্ছে লতানো গাছের, যেগুলো মাচানের ওপর বা কোন কিছুকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করে। আর দ্বিতীয় ধরনের বাগান হচ্ছে এমন সব গাছের যেগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের ভাষায় বাগান শব্দটি কেবলমাত্র এ দ্বিতীয় ধরনের বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে কেবল جنت غير معروشت এর অনুবাদ করা হয়েছে বাগান। আর جنت معروشت এর অর্থ করা হয়েছে লতাগুল্ম।

১১৭. মূল আয়াতে فرش শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক ধরনের পশুকে ফরশ বলা হয়েছে। এ অর্থে যে, তারা আকারে ছোট এবং যমীনের সাথে মিশে চলাফেরা করে। অথবা তাদেরকে এ জন্য ফরশ বলা হয়েছে যে, যবেহ করার সময় তাদেরকে যমীনের ওপর শোয়ানো হয়। অথবা তাদের চামড়া ও লোম থেকে ফরশ্ বা বিছানা বানানো হয় তাই তাদেরকে ফরশ বলা হয়েছে।

১১৮. বক্তব্য বিষয়টির ধারাবাহিক বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে মহান আল্লাহ তিনটি কথা হৃদয়ংগম করাতে চান। এক, তোমরা এই যে বাগান, ক্ষেত–খামার ও গবাদি পশু লাভ করেছো, এগুলো সবই আল্লাহর দান। এ দানে অন্য কারোর কোন অংশ নেই। তাই এ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারেও কারোর কোন অংশ থাকতে পারে না। দুই, এগুলো যেহেতু আল্লাহর দান তাই এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে। এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কোন সীমা নির্ধারণ করে দেবার অধিকার কারোর নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নির্ধারিত রীতি ও নিয়মের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নযরানা পেশ করাই সীমা অতিক্রম করার নামান্তর এবং এটিই শয়তানের অনুসৃতি। তিন, এসব জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের পানাহার ও ব্যবহার করার জন্য। এগুলোকে অযথা নিজের জন্য হারাম করে নেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। নিজেদের আন্দাজ–অনুমান ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে লোকেরা আল্লাহর দেয়া রিযিক এবং তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের ওপর যেসব বিধি–নিষেধ আরোপ করেছে সেগুলো সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ
ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

এ আটটি নর ও মাদী, দু'টি মেষ শ্রেণীর ও দুটি ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি অথবা মেষ ও ছাগলের পেটে যে বাচ্চা আছে সেগুলো? যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১১৯] *আর এভাবে দু'টি উট শ্রেণীর ও দুটি গাভী শ্রেণীর মধ্য থেকে। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি, না সেই বাচ্চা যা উটনী ও গাভীর পেটে রয়েছে?*[১২০] *তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এদের হারাম হবার হুকুম দিয়েছিলেন? কাজেই তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঠিক জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা। নিসন্দেহে আল্লাহ এহেন জালেমদের সত্য–সঠিক পথ দেখাননা।*

১১৯. অর্থাৎ আন্দাজ, অনুমান, ধারণা বা পৈত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কার পেশ করো না। বরং যথার্থ ও সুনিশ্চিত তথ্য ও জ্ঞান পেশ করো, যদি তা তোমাদের কাছে থাকে।

১২০. তাদের নিজেদের ধারণা, অনুমান ও কুসংস্কার যাতে তাদের নিজেদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সে উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্নগুলো এমন বিস্তারিতভাবে তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর পশুর নর হালাল ও মাদী হারাম অথবা মাদী হালাল ও নর হারাম বা পশুটি হালাল কিন্তু তার গর্ভস্থিত বাচ্চাটি হারাম—এগুলো এমন সুস্পষ্ট অযৌক্তিক কথা যে, কোন সুস্থ বিবেক একথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ কখনো এ ধরনের অর্থহীন বাজে হুকুম দিতে পারেন তা কোন বুদ্ধিমান মানুষ কল্পনাও

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ
اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৮ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যে অহী আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে তো আমি এমন কিছু পাই না যা খাওয়া কারো ওপর হারাম হতে পারে, তবে মরা, বহমান রক্ত বা শুয়োরের গোশ্‌ত ছাড়া। কারণ তা নাপাক। অথবা যদি অবৈধ হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করার কারণে।[১২১] *তবে অক্ষম অবস্থায় যে ব্যক্তি (তার মধ্য থেকে কোন জিনিস খেয়ে নেবে) নাফরমানীর ইচ্ছা না করে এবং প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তোমার রব ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। আর যারা ইহুদীবাদ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য নখরধারী প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাঁদের পিঠ, অন্ত্র বা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম।*[১২২] *আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য।*

করতে পারে না। তাছাড়া কুরআন যে পদ্ধতিতে আরববাসীদেরকে তাদের এ সমস্ত ধারণা–কল্পনা ও কুসংস্কারের অযৌক্তিকতা বুঝাবার চেষ্টা করেছে ঠিক সে একই পদ্ধতিতে দুনিয়ার যেসব জাতির মধ্যে পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে হারাম–হালালের অযৌক্তিক বিধি–নিষেধ এবং অস্পৃশ্যতাবোধ ও ছোঁয়া–ছুঁয়ির নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তাদের সেই সমস্ত কুসংস্কার ও ধারণা–কল্পনার অযৌক্তিকতা সম্পর্কেও তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে।

১২১. এ বিষয়টি সূরা আল বাকারার ১৭৩ আয়াতে এবং সূরা আল মায়েদাহর ৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আন নাহ্‌লের ১১৫ আয়াতেও এ আলোচনা আসবে।

সূরা আল বাকারার আয়াত এবং এ আয়াতটির মধ্যে বাহ্যত কেবলমাত্র এতটুকু বিরোধ দেখা যায় যে, সেখানে শুধু "রক্ত" বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে "বহমান রক্ত"। অর্থাৎ কোন প্রাণীকে জখম বা জবাই করে যে রক্ত বের করা হয়। কিন্তু এটা আসলে কোন বিরোধ নয় বরং ঐ নির্দেশটির ব্যাখ্যা। অনুরূপভাবে সূরা আল মায়েদাহর আয়াতে এ চারটি জিনিস ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিসের হারাম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এমনসব প্রাণীকেও সেখানে হারাম গণ্য করা হয়েছে যারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে মরে গেছে। অথবা কোন হিংস্র প্রাণী যাকে চিরে ফেড়ে ফেলেছে। কিন্তু আসলে এটাও কোন বিরোধ নয়। বরং এটাও একটা ব্যাখ্যা। এ থেকে জানা যায়, এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণীরাও 'মরা' বলে গণ্য হবে।

মুসলিম ফকীহগণের একটি দলের মতে আহারযোগ্য প্রাণীদের এ চারটি অবস্থায়ই মাত্র হারাম। এ ছাড়া আর সব ধরনের প্রাণী খাওয়া জায়েয। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)ও এমত পোষণ করতেন। কিন্তু একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন জিনিস খেতে মানা করেছেন অথবা সেগুলোর প্রতি নিজের ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন গৃহপালিত গাধা, নখরযুক্ত হিংস্র পশু ও পাঞ্জাধারী পাখি। এ কারণে অধিকাংশ ফকীহ হারামকে এ চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা এর সীমারেখা আরো বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এর পরও আবার বিভিন্ন জিনিসের হারাম ও হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে যেমন গৃহপালিত গাধা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ হারাম গণ্য করেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন ফকীহ বলেন, গৃহপালিত গাধা হারাম নয় বরং কোন বিশেষ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। হানাফীদের মতে হিংস্র পশু, শিকারী পাখি ও মৃত ভক্ষণকারী প্রাণী একেবারেই হারাম। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আওযাঈর মতে শিকারী পাখি হালাল। ইমাম লাইসের মতে বিড়াল হালাল। ইমাম শাফেঈর মতে একমাত্র মানুষের ওপর আক্রমণকারী হিংস্র পশু যেমন বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হারাম। ইকরামার মতে কাক ও চিল উভয়ই হালাল। অনুরূপভাবে হানাফীরা সব রকমের পোকামাকড় হারাম গণ্য করে। কিন্তু ইবনে আবী লাইলা, ইমাম মালেক ও আওযাঈর মতে সাপ হালাল।

এসব বিভিন্ন বক্তব্য ও এর পক্ষের বিপক্ষের যুক্তি প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে একথা জানা যায় যে, আসলে কুরআনে যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতে সে চারটিই চূড়ান্ত ও অকাট্যভাবে হারাম। এ চারটি জিনিস যেখানে নেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের মাকরূহ বা অপছন্দের ভাব রয়েছে। যেগুলোর মাকরূহ হবার বিষয়টি সহী হাদীসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সেগুলো হারাম হবার বেশী নিকটবর্তী। আর যেগুলোর ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে তাদের হারাম হবার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। তবে রুচিগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে কেউ কেউ কোন কোন জিনিস খাওয়া পছন্দ করে না অথবা শ্রেণীগতভাবে কোন কোন শ্রেণীর মানুষ কোন কোন জিনিস অপছন্দ করে বা জাতিগতভাবে কোন কোন জাতি কোন কোন জিনিসকে ঘৃণা

করে,—এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াত কাউকে বাধ্য করে না যে, যে জিনিসটি হারাম করা হয়নি প্রয়োজন না হলেও অযথা তা তাকে খেতেই হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজের অপছন্দকে আইনে পরিণত করবে এবং সে নিজে যা পছন্দ করে না অন্যেরা তা ব্যবহার করছে বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে, এ ধরনের কোন অধিকারও শরীয়াত কাউকে দেয়নি।

১২২. এ বিষয়টি কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে বিবৃত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ "এ সমস্ত খাদ্যবস্তু (শরীয়াতে মুহাম্মাদীয়ায় যা হালাল হিসেবে গণ্য) বনী ইসরাঈলদের জন্যও হালাল ছিল। তবে কিছু জিনিস এমন ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাযিলের পূর্বে ইসরাঈলীরা নিজেরাই নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। ওদেরকে বলো, তাওরাত আনো এবং তার কোন উদ্ধৃতি পেশ করো, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৯৩ আয়াত) সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলদের অপরাধের কারণে "আমি এমন বহু পাক–পবিত্র বস্তু তাদের ওপর হারমা করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল।" (১৬০ আয়াত) আর এখানে বলা হয়েছে ঃ এদের অবাধ্যতার কারণে আমি সমস্ত নখরধারী প্রাণী এদের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং ছাগল ও গরুর চর্বিও এদের জন্য হারাম গণ্য করেছি। এ তিনটি আয়াত একত্র করলে জানা যায়, শরীয়াতে মুহাম্মাদী ও ইহুদী ফিকাহর মধ্যে আহারযোগ্য প্রাণীদের হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে দু'টি কারণে পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ তাওরাত নাযিল হবার শত শত বছর আগে ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালাম কোন কোন জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরে তাঁর সন্তানরাও সেগুলো ত্যাগ করেছিল। এমনকি ইহুদী ফকীহগণ এগুলোকে রীতিমত হারাম মনে করতে থাকে এবং এগুলোর হারাম হওয়ার বিষয়টি তাওরাতে লিখে নেয়। উট, খরগোশ ও শাফনও এ হারামের তালিকার অন্তরভুক্ত ছিল। বর্তমান বাইবেলে আমরা তাওরাতের যে অংশটুকু পাই তাতে এ তিনটিরই হারাম হবার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ ৪–৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ ৭) কিন্তু কুরআন মজীদে ইহুদীদের যে এ বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল ঃ আনো তাওরাত এবং দেখাও কোথায় এ জিনিসগুলো হারাম বলে লেখা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তাওরাতে এ বিধানগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে এ ঘটনার পর। কারণ তখন যদি তাওরাতে এ বিধানগুলো থাকতো, তাহলে বনী ইসরাঈল সংগে সংগেই তাওরাত এনে তা দেখিয়ে দিতো।

দুই ঃ দ্বিতীয় পার্থক্যটি সৃষ্টি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, ইহুদীরা যখন আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং নিজেদের আইন নিজেরাই প্রণয়ন করতে শুরু করলো তখন নিজেদের চুলচেরা আইনগত বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ির মাধ্যমে তারা অনেক পাক–পবিত্র জিনিসকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল এবং এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে এ বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নখরধারী প্রাণী। অর্থাৎ উটপাখি, বক, হাঁস ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গরু ও ছাগলের চর্বি। এ দু' ধরনের হারামকে বাইবেলে তাওরাতের বিধানের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ১৬–১৮, দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ১৪–১৫–১৬, লেবীয় পুস্তক ৩ঃ১৭ এবং ৭ঃ২২–২৩) কিন্তু সূরা নিসা থেকে জানা যায়, এ জিনিসগুলো

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।[১২৩]

এ মুশরিকরা (তোমাদের এসব কথার জবাবে) নিশ্চয়ই বলবে, "যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরকও করতাম না, আমাদের বাপ–দাদারাও শিরক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না।"[১২৪] *এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এভাবে তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, "তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক অনুমানের ওপর চলছো এবং শুধুমাত্র ধারণা ও আন্দাজ করা ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই।" তাহলে বলো, (তোমাদের এ যুক্তির মোকাবিলায়) প্রকৃত সত্যে উপনীত অকাট্য যুক্তি তো আল্লাহর কাছে আছে। অবশ্যি যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখাতেন।*[১২৫]

তাওরাতে হারাম ছিল না। বরং হযরত ইসা আলাইহিস সালামের পর এগুলো হারাম হয়েছে। ইতিহাসও সাক্ষ দেয়, বর্তমান ইহুদী শরীয়াত লিপিবদ্ধ করার কাজ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে রাব্বি ইয়াহুদার হাতে সম্পন্ন হয়।

এখন বাকি থাকে এ প্রশ্নটি, তাহলে মহান আল্লাহ এ জিনিসগুলো সম্পর্কে এখানে এবং সূরা নিসায় (আমি হারাম করেছি) শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ কেবলমাত্র নবী ও কিতাবের মাধ্যমে কোন জিনিস হারাম করেন না। বরং তিনি

কখনো তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদের ওপর বানোয়াট বিধান রচয়িতা ও আইন প্রণেতাদের চাপিয়ে দেন এবং তারা পাক-পবিত্র জিনিসগুলো তাদের জন্য হারাম করে দেয়। প্রথম ধরনের হারামটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় ধরনের হারামটি প্রবর্তিত হয় তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি ও লানত হিসেবে।

১২৩. অর্থাৎ এখনো যদি তোমরা নিজেদের নাফরমানীর নীতি ও কার্যক্রম পরিহার করে বন্দেগীর সঠিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের রবের অনুগ্রহের ক্ষেত্র নিজেদের জন্য অনেক বেশী বিস্তৃত পাবে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের এই অপরাধ বৃত্তি ও বিদ্রোহী মানসিকতার ওপর অবিচল থাকো তাহলে ভালভাবে জেনে রাখো, তাঁর গযব থেকে তোমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

১২৪. অর্থাৎ অপরাধী ও অসৎলোকেরা নিজেদের অপরাধ ও অসৎকাজের স্বপক্ষে হামেশা যে ধরনের ওজর পেশ করে এসেছে তারাও সে একই ওযর পেশ করতে থাকবে। তারা বলবে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ চান আমরা শিরক করি এবং যে জিনিসগুলোকে আমরা হারাম করে নিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাক। নয়তো আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা এমনটি না করি তাহলে এ ধরনের কাজ করা আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভবপর হতো? যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি তাই আমরা ঠিকই করছি। কাজেই এ ব্যাপারে কোন দোষ হয়ে থাকলে সে জন্য আমরা নই, আল্লাহ দায়ী। আর আমরা যা কিছু করছি এমনটি করতে আমরা বাধ্য। কারণ এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

১২৫. এটি তাদের ওজুহাতের পূর্ণাংগ জওয়াব। এ জওয়াবটি বুঝার জন্য এর যথার্থ বিশ্লেষণ করতে হবে ঃ

এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে, নিজেদের অন্যায় কাজ ও গোমরাহীর জন্য আল্লাহর ইচ্ছাকে ওযর হিসেবে পেশ করা এবং এর বাহানা বানিয়ে সঠিক হেদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো অপরাধীদের প্রাচীন রীতি হিসেবে চলে আসছে। এর পরিণামে দেখা গেছে অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে চলার অশুভ পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমরা যে ওযরটি পেশ করছো তার পেছনে প্রকৃত জ্ঞানগত ও তথ্যগত কোন ভিত্তি নেই। বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা এটি পেশ করছো। তোমরা নিছক কোথাও আল্লাহর ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়েছো তারপর তার ওপর অনুমানের একটি বিরাট ইমারত দাঁড় করিয়ে দিয়েছো। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কি, একথা বুঝার চেষ্টাই তোমরা করোনি। তোমরা আল্লাহর ইচ্ছা বলতে মনে করছো, চোর যদি আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে চুরি করে তাহলে সে অপরাধী নয়। কারণ সে তো আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে চুরি করেছে। অথচ মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে এই যে, সে কৃতজ্ঞতা ও কুফরী, হেদায়াত ও গোমরাহী এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্য থেকে যে পথটিই নিজের জন্য নির্বাচিত করবে, আল্লাহ তার জন্য সে পথটিই উন্মুক্ত করে দেবেন। তারপর মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুল যে কাজটিই করতে চাইবে, আল্লাহ নিজের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের দৃষ্টিতে যতটুকু সংগত মনে করবেন তাকে সে কাজটি করার অনুমতি ও সুযোগ দান করবেন। কাজেই তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে যদি শিরক ও পবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম গণ্য

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

এদেরকে বলে দাও, "আনো তোমাদের সাক্ষী, যে এ সাক্ষ দেবে যে, আল্লাহই এ জিনিসগুলো হারাম করেছেন।" তারপর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ দিয়ো না।[১২৬] এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, যারা আখেরাত অস্বীকারকারী এবং অন্যদেরকে নিজেদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায় কখখনো তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলো না।

করার সুযোগ লাভ করে থাকো তাহলে এর অর্থ কখনোই এ নয় যে, তোমরা নিজেদের এসব কাজের জন্য দায়ী নও এবং এ জন্য তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভুল পথ নির্বাচন, ভুল সংকল্প গ্রহণ ও ভুল প্রচেষ্টার জন্য দায়ী।

সবশেষে একটি বাক্যের মধ্যে আসল কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ، فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিজেদের ওযর পেশ করতে গিয়ে তোমরা এ মর্মে যে যুক্তিটির অবতারণা করেছো যে, "আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না" এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ কথাটি ব্যক্ত হয়নি। সম্পূর্ণ কথাটি বলতে হলে এভাবে বলো ঃ "আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতেন।" অন্য কথায় তোমরা নিজেরা নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। বরং তোমরা চাও, আল্লাহ যেভাবে ফেরেশতাদেরকে জন্মগতভাবে সত্যানুসারী বানিয়েছেন সেভাবে তোমাদেরকেও বানাতেন। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এ ইচ্ছা করলে অবশ্যি করতে পারতেন। কিন্তু এটি তাঁর ইচ্ছা নয়। কাজেই নিজেদের জন্য তোমরা নিজেরাই যে গোমরাহীটি পছন্দ করে নিয়েছো আল্লাহ তার মধ্যেই তোমাদের ফেলে রাখবেন।

১২৬. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন করে এবং যে বিষয়ের জ্ঞান মানুষের আছে সে বিষয়ের সাক্ষই তার দেয়া উচিত, এ সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহলে তাদের সমাজে পানাহারের ওপর বিধি–নিষেধের যে মনগড়া নিয়ম–রীতি প্রচলিত রয়েছে, অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি খেতে পারবে না এবং অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে না, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা যে আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত হয়েছে, সেরূপ সাক্ষ দেবার সাহসই কখনো তারা করবে না। কিন্তু যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন না করেই আল্লাহর নামে মিথ্যা সাক্ষ দেবার মতো নির্লজ্জতার পরিচয় দিতে

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি–নিষেধ আরোপ করেছেন।[১২৭]

(১) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না[১২৮]

(২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[১২৯]

(৩) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো।

(৪) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না।[১৩০]

(৫) আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না।[১৩১]

তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে–চিন্তে কাজ করবে।

ইতস্তত না করে, তাহলে তাদের এ মিথ্যাচারে তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না। কারণ তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ এ জন্য চাওয়া হচ্ছে না যে, তারা যদি এ সাক্ষ দিয়ে দেয়, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নেবে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে যাদের মধ্যে কিছুমাত্র সত্যনিষ্ঠা আছে তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, সত্যই কি এ নিয়ম–কানুন ও বিধি–নিষেধগুলো আল্লাহ নির্ধারিত কিনা এবং তোমরা কি যথার্থ ঈমানদারীর সাথে এর সত্যতার সাক্ষ দিতে পারো? তখন তারা নিজেদের এ নিয়ম–রীতিগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করবে এবং যখন এগুলোর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবার কোন প্রমাণই পাবে না তখন তারা এ অর্থহীন রীতিনীতি ও নিয়ম–কানুনগুলোর আনুগত্য পরিহার করবে।

১২৭. অর্থাৎ তোমরা যেসব বিধি–নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছো সেগুলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি–নিষেধ নয়। বরং মানুষের জীবনকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ যেসব বিধি–নিষেধ আরোপ করেছেন এবং যেগুলো সর্বকালে ও সর্বদেশে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মৌল বিষয় হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলোই হচ্ছে আসল বিধি–নিষেধ। (তুলনামূলক আলোচনার জন্য বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায় দেখুন)।

১২৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা–ইখতিয়ারে বা তাঁর অধিকারে কোন ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করো না।

আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অর্থ হচ্ছে, ইলাহী সত্তার মৌল উপাদানে কাউকে অংশীদার করা। যেমন খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদা, আরব মুশরিকদের ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা গণ্য করা এবং অন্যান্য মুশরিকদের নিজেদের দেবদেবীদেরকে এবং নিজেদের রাজ পরিবারগুলোকে আল্লাহর বংশধর বা দেবজ ব্যক্তিবর্গ হিসেবে গণ্য করা—এসবগুলোই আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অন্তরভুক্ত।

আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর জন্য যে অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি অবস্থায় সেগুলোকে বা তার কোনটিকে অন্য কারোর জন্য নির্ধারিত করা। যেমন কারোর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, সমস্ত অদৃশ্য সত্য তার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। অথবা সে সবকিছু দেখে ও সবকিছু শোনে। অথবা সে সবরকমের দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত একটি পবিত্র সত্তা।

ক্ষমতা–ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহ হবার কারণে যে সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে বা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করে নেয়া। যেমন অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কাউকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করা, কারোর অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, কাউকে সাহায্য করা, কারোর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, কারোর প্রার্থনা শোনা, ভাগ্য ভাঙ্গাগড়া করা। এ ছাড়া হারাম–হালাল ও জায়েয–নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন–বিধান রচনা করা। এসবই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। এর মধ্য থেকে কোন একটিকেও আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করা শিরক।

অধিকারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ হবার কারণে বান্দাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অধিকার রয়েছে। সে অধিকারসমূহ বা তার মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য মেনে নেয়া। যেমন রুকূ ও সিজদা করা, বুকে হাত বেঁধে বা হাত জোড় করে দাঁড়ানো, সালামী দেয়া ও আস্তানা চুম্বন করা, নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নযরানা ও কুরবানী পেশ করা, প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মানত করা, বিপদ–আপদে সাহায্যের জন্য আহবান করা এবং এভাবে পূজা–অর্চনা, সম্মান ও মর্যাদা দান করার জন্য অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকার। অনুরূপভাবে কাউকে এমন প্রিয় জ্ঞান করা যে, তার প্রতি ভালবাসার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত ভালবাসাকে উৎসর্গ করে দেয়া হয় এবং কাউকে এমন ভয় করা যে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তার

অসন্তোষকে ভীতির নজরে দেখা—এসবও একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশকে ভুল ও নির্ভুলের মানদণ্ড মনে করা এবং এমন কোন আনুগত্যের শৃংখল নিজের গলায় পরিধান না করা যা আল্লাহর আনুগত্যের শৃংখলমুক্ত একটি স্বতন্ত্র আনুগত্য এবং যার নির্দেশের পেছনে আল্লাহর নির্দেশের সনদ নেই—এসবও আল্লাহর অধিকার। এ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অধিকারও কাউকে দেয়া হলে, তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নামগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নাম না দিলেও তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

১২৯. আদব, সম্মান, আনুগত্য, সন্তুষ্টি বিধান, সেবা সবকিছুই সদ্ব্যবহারের অন্তরভূক্ত। কুরআনের সর্বত্র পিতামাতার এ অধিকারকে তাওহীদের বিধানের পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর পর বান্দার অধিকারের দিক দিয়ে মানুষের ওপর তার পিতামাতার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

১৩০. এখানে আসল শব্দ হচ্ছে فواحش । এ শব্দটি এমন সব কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেগুলো সুস্পষ্ট খারাপ কাজ হিসেবে পরিচিত। কুরআনে ব্যভিচার, সমকাম (পুরুষ কামিতা), উলংগতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করাকে ফাহেশ কাজের অন্তরভূক্ত করা হয়েছে। হাদীসে চুরি ও মদপানের সাথে সাথে ভিক্ষাবৃত্তিকেও ফাহেশ ও অশ্লীল কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত নির্লজ্জতার কাজও ফাহেশের অন্তরভূক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, এ ধরনের কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনভাবেই করা যাবে না।

১৩১. অর্থাৎ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রাণকে হারাম ও মর্যাদা সম্পন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। তাকে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ছাড়া কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ "ন্যায়সংগতভাবে" বা "ন্যায় ও সত্যের খাতিরে" এর অর্থ কি? কুরআনে এর তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আরো দু'টি পর্যায় বৃদ্ধি করেছেন। কুরআন বর্ণিত তিনটি পর্যায় হচ্ছে ঃ

(১) যখন এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করার অপরাধ করে এবং হত্যাকারীর ওপর কিসাস বা রক্তপণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(২) যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে।

হাদীসে বর্ণিত অন্য পর্যায় দু'টি হচ্ছে ঃ

(৪) কোন ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করলে।

(৫) কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে এবং মুসলিম সমাজ ত্যাগ করলে। এ পাঁচটি পর্যায় ও অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না। সে মুমিন, যিম্মী বা সাধারণ কাফের যেই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই তার রক্ত হালাল নয়।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ
وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ
اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

(৬) আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো।[১৩২]

(৭) ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে।[১৩৩]

(৮) যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়–স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন।

(৯) আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো।[১৩৪]

এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

(১০) এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।[১৩৫] এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।

তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীল মানুষের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের বিশদ বিবরণ, সরাসরি পথ নির্দেশ ও রহমত ছিল, (এবং তা এ জন্য বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল যে,) সম্ভবত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনবে।[১৩৬]

১৩২. অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে, যা হবে সর্বাধিক নিঃস্বার্থপরতা, সদুদ্দেশ্য ও এতীমের প্রতি সদিচ্ছা ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার বিরুদ্ধে আল্লাহর অসন্তোষ বা মানুষের আপত্তি উত্থাপন করার কোন অবকাশই না থাকে।

১৩৩. এটি যদিও আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নীতি তবুও এটি বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজস্ব পরিসরে ওজন–পরিমাপ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা ও ইনসাফের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবে সে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিছু ভুল–চুক বা অজ্ঞাতসারে কমবেশী হয়ে গেলে সে জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৩৪. "আল্লাহর অংগীকার" বলতে এমন অংগীকারও বুঝায় যা মানুষ তার সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহর তথা আল্লাহর সাথে করে। আবার এমন অংগীকারও বুঝায় যা আল্লাহর নামে বান্দার সাথে করে। একটি মানব শিশু এ আল্লাহর যমীনে মানব সমাজে চোখ মেলে তাকাবার সাথে সাথেই আল্লাহ ও মানুষ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে যে অংগীকারের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাও এ অংগীকারের অন্তরভুক্ত।

প্রথম অংগীকার ও চুক্তি দু'টি হয় সচেতন ও ইচ্ছাকৃত। অন্যদিকে তৃতীয়টি হয় একটি প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত (Natural Contact) অংগীকার ও চুক্তি। এ তৃতীয় চুক্তিটি সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের কোন হাত না থাকলেও পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন হবার দিক দিয়ে প্রথম দু'টির তুলনায় এটি কোন অংশে খাটো নয়। আল্লাহ মানুষকে যে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাকে যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছেন, তাকে দেহের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা দান করেছেন, যমীনে তার জন্য সৃষ্ট উপায়–উপকরণ ও জীবিকা ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রাকৃতিক বিধি–ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপনের যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয় তা থেকে লাভবান হবার যে সুযোগ তাকে দিয়েছেন–এসবগুলোই স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে তার ওপর আল্লাহর কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে মানব শিশুর একটি মানব জননীর পেটে তার রক্তে প্রতিপালিত হওয়া, একটি পিতার পরিশ্রমলব্ধ কুটীরে জন্মগ্রহণ করা এবং একটি সমাজবদ্ধ অংগনে অসংখ্য সংগঠন সংস্থা থেকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য–সহায়তা লাভ করার কারণে মর্যাদা ও গুরুত্বের ক্রমানুসারে তার ওপর বহু ব্যক্তি ও সমাজ সংস্থার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের কৃত এই অংগীকার অবশ্যি কোন কাগজে লিখিত হয়নি ঠিকই কিন্তু এ অংগীকার ও চুক্তির বাণী মানুষের শিরা উপশিরায় ও তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপে মোহরাংকিত হয়ে আছে। মানুষ সচেতনভাবে এ চুক্তিবদ্ধ হয়নি ঠিকই কিন্তু তার সমগ্র সত্তা এ চুক্তি ও অংগীকারের ফসল। এ চুক্তি ও অংগীকারের দিকে সূরা বাকারার ২৭ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ফাসেক হচ্ছে তারা যারা "আল্লাহর সাথে অংগীকার করার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।" পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আ'রাফের ১৭২ আয়াতেও এরি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদি পর্বে আল্লাহ আদমের পিঠ থেকে তার সন্তানদের বের করে তাদেরকে এ মর্মে সাক্ষ দিতে বলেছিলেন—আমি কি তোমাদের রব নই? এর জবাবে তারা স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, হাঁ আমরা এর সাক্ষী।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

২০ রুকূ'

আর এভাবেই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। এখন তোমরা আর একথা বলতে পারো না যে, কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি দলকে[১৩৭] এবং তারা কি পড়তো পড়াতো তাতো আমরা কিছুই জানি না। আর এখন তোমরা এ ওজুহাতও দিতে পারো না যে, যদি আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সত্য পথানুসারী প্রমাণিত হতাম। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও রহমত এসে গেছে। এখন তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[১৩৮] যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এ সত্য বিমুখতার কারণে তাদেরকে আমি নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবো।

১৩৫. যে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অংগীকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ তার রবের দেখানো পথে চলবে। কারণ তার রবের নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আত্মম্ভরিতা, স্বেচ্ছাচার ও অন্যের দাসত্বের পথে পা বাড়ানো মানুষের পক্ষ থেকে সে অংগীকারের প্রাথমিক বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে পরিগণিত হবে। এরপর প্রতি পদক্ষেপে তার ধারাগুলো লংঘিত হতে থাকবে। এ ছাড়াও মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ গ্রহণ করে তাঁর দেখানো পথে জীবন যাপন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এ অত্যন্ত নাজুক, ব্যাপক ও জটিল দায়িত্ব পালন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। আল্লাহ প্রদত্ত এ পথনির্দেশ গ্রহণ না করার ফলে মানুষকে

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَانِهَا
خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوٓا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

লোকেরা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতারা এসে দাঁড়াবে অথবা তোমার রব নিজেই এসে যাবেন বা তোমার রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিশানী প্রকাশিত হবে?[১৩৯] যে দিন তোমার রবের বিশেষ কোন কোন নিশানী প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে লাগবে না যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের সাহায্যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি।[১৪০] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৪১] তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা কি করেছে, সে কথা তিনিই তাদেরকে জানাবেন।

দু'টি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এক, অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ থেকে মানুষ অনিবার্যভাবে সরে যায়। দুই, এ সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই অসংখ্য সরু সরু পথ সামনে এসে যায়। এ পথগুলোয় চলতে গিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে সমগ্র মানব সমাজ বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানব সমাজের এ বিপর্যয় ও বিক্ষিপ্ততা তার উন্নতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির সুখ স্বপ্নকে চিরতরে ধূলিস্মাত করে দেয়। এ দু'টি ক্ষতিকে এখানে নিম্নোক্ত বাক্যের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "অন্য পথে চলো না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।" (সূরা আল মায়েদাহর ৩৫ টীকাটিও দেখুন)।

১৩৬. রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ নিজেকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করা এবং দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করা। এখানে এ

বক্তব্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ কিতাবের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার ফলে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জেগে উঠবে। দুই, সাধারণ মানুষ এ উন্নত জীবন বিধান অধ্যয়ন করে এবং সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে এ হেদায়াত ও রহমতের প্রভাব লক্ষ করে একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আখেরাত অস্বীকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্ট দায়িত্বহীন জীবনের মোকাবিলায় আখেরাত স্বীকৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন সব দিক দিয়েই উত্তম। আর এভাবে এ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন তাকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে টেনে আনবে।

১৩৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে।

১৩৮. আল্লাহর আয়াত বলতে কুরআনের আকারে মানুষের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছিল তাও বুঝাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের পাক-পাবিত্র জীবনে যেসব নিশানী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সেগুলোও বুঝাবে আবার কুরআন তার দাওয়াতের সমর্থনে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনগুলো পেশ করছিল সেগুলোও বুঝাবে।

১৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের নিশানী বা আযাব অথবা এমন কোন নিশানী যা প্রকৃত সত্যের ওপর থেকে পুরোপুরি পর্দা উঠিয়ে নেয় এবং যার আত্মপ্রকাশের ফলে পরীক্ষার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১৪০. অর্থাৎ এ ধরনের নিশানী দেখে নেবার পর যদি কোন কাফের তার কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমানের দিকে চলে আসে তাহলে তার এ ঈমান আনাটা হবে অর্থহীন। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় কোন নাফরমান মুমিন যদি তার নাফরমানীর কার্যক্রম পরিহার করে অনুগত মুমিনের জীবন যাপন করতে শুরু করে দেয় তাহলে তাও হবে সমান অর্থহীন। কারণ প্রকৃত সত্য যতক্ষণ পর্দান্তরালে রয়েছে ততক্ষণই থাকছে ঈমান ও আনুগত্যের মূল্য ও মর্যাদা। এখানে অবকাশের সুযোগ অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত দেখা যাচ্ছে এবং দুনিয়া তার আত্মম্ভরিতা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত উপকরণ সহকারে প্রতারণা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে তার প্রতারণা জাল বিস্তার করে ঘোষণা করছে ঃ কিসের আল্লাহ খোদা? কোথায় আখেরাত? এসব মিথ্যা। আসলে দুনিয়ায় যে ক'দিন আছো, খাও দাও, ফূর্তি করো।

১৪১. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে ঃ এক আল্লাহকে ইলাহ ও রব বলে মেনে নাও। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকারে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে মনে করে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তাঁর রসূলদের ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে ব্যাপক মূলনীতি ও মৌল বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন সে অনুযায়ী জীবন যাপন করো। এগুলোই চিরকাল আসল দীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং এখনো যথার্থ দীন বলতে এগুলোকেই বুঝায়। জন্মের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেক মানুষকে এ দীনই দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগের লোকেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ও মানসিকতার ভ্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে অথবা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে বা

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى
اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ
كِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাযির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকুই প্রতিফল পাবে যতটুকু অপরাধ সে করেছে এবং কারোর ওপর জুলুম করা হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমার রব নিশ্চিতভাবেই আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একদম সঠিক নির্ভুল দীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পদ্ধতি,[১৪২] যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না। বলো, আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান,[১৪৩] আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এরি নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।

ভক্তির আতিশয্যে এ আসল দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সৃষ্টি করেছে। এ দীনের মধ্যে তারা নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিয়েছে। নিজেদের কুসংস্কার, কল্পনা, বিলাসিতা, আন্দাজ-অনুমান ও নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ছাঁচে ফেলে তার আকীদা বিশ্বাসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কাটাই ছাঁটাই এর মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে। অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তার বিধানসমূহের সাথে জুড়ে দিয়েছে। মনগড়া আইন রচনা করেছে। আইনের খুটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে অযথা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ করার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। গুরুত্বপূর্ণকে গুরুত্বহীন ও গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। যেসব নবী-রসূল এ দীন প্রচার করেছেন এবং যেসব মহান মনীষী ও বুযর্গ এ দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করে গেছেন তাদের কারোর কারোর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে আবার কারোর কারোর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক?[১৪৪] প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে সে জন্য সে নিজে দায়ী, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না[১৪৫] তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। সে সময় তোমাদের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন। তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর অধিক উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।[১৪৬] নিসন্দেহে তোমার রব শাস্তি দেবার ব্যাপারে অতি তৎপর এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

প্রকাশ ঘটিয়ছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে। এভাবে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে চলেছে। এদের প্রত্যেকটি ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব মানব সমাজকে কলহ, বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এভাবে মানব সমাজ দ্বন্দ্বমুখর দলে–উপদলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। কাজেই বর্তমানে যে ব্যক্তিই আসল দীনের অনুসারী হবে, তার জন্য এসব বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দলাদলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে নিজেদের পথকে আলাদা করে নেয়াই হবে অপরিহার্য।

১৪২. "ইবরাহীমের পদ্ধতি" বলে এ পথকে চিহ্নিত করার জন্য তার আর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একে মূসার পদ্ধতি বা ঈসার পদ্ধতিও বলা যেতো। কিন্তু লোকেরা ইহুদীবাদকে হযরত মূসার এবং খৃস্টবাদকে হযরত ঈসার আনিত বিধান বলে আখ্যায়িত করে রেখেছে। তাই বলা হয়েছে, "ইবরাহীমের পদ্ধতি"। ইহুদী ও খৃস্টান উভয় দলই হযরত ইবরাহীমকে সত্যানুসারী বলে স্বীকার করে এবং তারা উভয়ে একথাও জানে যে, ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের উদ্ভবের অনেক আগেই হযরত ইবরাহীমের যুগ শেষ হয়েছিল।

তাছাড়া আরবের মুশরিকরাও তাঁকে সত্যপন্থী বলে স্বীকার করতো এবং নিজেদের সকল প্রকার অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা অন্ততপক্ষে এতটুকু স্বীকার করতো যে, কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী পাক–পবিত্র ব্যক্তি মূর্তি পূজারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আল্লাহর অনুগত বান্দা।

১৪৩. এখানে যে মূল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে نسك । এর অর্থ কুরবানীও হয়। আর ব্যাপক ও সাধারণভাবে এটিকে বন্দেগী ও পূজা–অর্চনার অন্যান্য বিভিন্ন অবস্থার জন্যও ব্যবহার করা হয়।

১৪৪. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের সমস্ত জিনিসের রব হচ্ছে আল্লাহ, কাজেই অন্য কেউ কেমন করে আমার রব হতে পারে? সমস্ত বিশ্ব–জাহান আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থার অধীনে সচল রয়েছে এবং বিশ্ব–জাহানের একটি অংশ হিসেবে আমার নিজের অস্তিত্বও সে পথের অনুসারী। কিন্তু নিজের চেতনাসঞ্জাত ও নিজস্ব ক্ষমতা ইখতিয়ারের আওতাধীন জীবনের জন্য আমি অন্য কোন রবের সন্ধান করবো, এটা কেমন করে যুক্তিসংগত হতে পারে? সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে আমি একাই কি অন্যদিকে চলতে থাকবো?

১৪৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী। একজনের কাজের দায়–দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপবে না।

১৪৬. এ বাক্যটির মধ্যে তিনটি সত্য বিবৃত হয়েছে ঃ এক, সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ অর্থে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিলোকের বহু জিনিস মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন এবং তা ব্যবহার করার স্বাধীন ক্ষমতা তাকে দান করেছেন।

দুই, আল্লাহ নিজেই এ প্রতিনিধিদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কারোর আমানতের গণ্ডী ব্যাপক আবার কারোর সীমাবদ্ধ। কাউকে বেশী জিনিস ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে দিয়েছেন কম। কাউকে বেশী কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে কম। আবার কোন কোন মানুষকে কোন কোন মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন।

তিন, এ সবকিছুই আসলে পরীক্ষার বিষয়বস্তু। সারা জীবনটাই একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। আল্লাহ যাকে যা কিছুই দিয়েছেন তার মধ্যেই তার পরীক্ষা। সে কিভাবে আল্লাহর আমানত ব্যবহার করলো? আমানতের দায়িত্ব কতটুকু অনুধাবন করলো এবং তার হক আদায় করলো? কতটুকু নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখলো? এ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ।